প্রাচীন চিত্র

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী

প্রণীত।

কাঁটালপাড়া, নৈহাটী।

প্রকাশক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজার—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী।

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

কোহিনুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ ১১১।৫এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য—।৵০ আনা।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্য পুস্তক।

অবকাশ (গদ্য পুস্তক) ... ||০

মালঞ্চ (পদ্য কাব্য) ... ||০

বঙ্কিম চিত্র (যন্ত্রস্থ) ... ১৲

গ্রন্থকারের ভ্রাতা শ্রীরামরমেন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (সামাজিক নাটক) ... ১|০

কাঁটালপাড়া বঙ্কিম চতুষ্পাঠী, পোঃ নৈহাটী ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

উপহার।

সদ্‌গুণরাশি—

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায়

পাণি-পল্লবে।

লাবণ্যে জলের লীলা— শতছন্দে ক্রীড়াশীলা,
অনুরাগে "রক্তজবা", "কুন্দ" শুচিতায়।
লাজে "যুঁই", ধৈর্য্যে "ধরা", রূপে "পদ্ম"—মধুভরা,
পবিত্র "অপরাজিতা" স্বামীর সেবায়।
নাহি হেরি সে রমণী— প্রকৃতির স্পর্শমণি,
মানবের শুভদাত্রী—সিদ্ধি সাধনায়।
গৃহের 'আনন্দময়ী',— মহিমায় 'বিশ্বজয়ী',
ক্ষীণ ছায়া জেগে আছে কবির কথায়!

(২)

প্রায় সবি "ছিন্নমস্তা" অবিদ্যাব্যসনে ত্রস্তা,
নিজ হস্তে মাথা কাটি নিজ রক্ত খায়!
জীবঘাতী কালকূট মাখামাখি ওষ্ঠপুট,
কণ্ঠে সুধা শুকায়েছে মত্ত—পিপাসায়!
ক্ষিপ্র আলিঙ্গন দিয়ে— দীপ্ত তেজে চমকিয়ে—
ছোটে নীরদের বুকে চপলার প্রায়!
আসক্তিতে জ্ব'লে' জ্ব'লে'— উন্মাদিনী পড়ে ট'লে',
জলভ্রমে মরীচিকা ইঙ্গিতে দেখায়!

এ দেশ—প্রেমের ভূমি— আদর্শ প্রেমিক ম—

মৃতপত্নী পুণ্যস্মৃতি রেখেছ হিয়ায়।

নূতন প্রণয় আগে, নূতন সংসার-পাশে—

হও নাই বিজড়িত তুচ্ছ কামনায়।

অতীতের গর্ব্বে ভুলি'— ক্ষীণ করে দীন 'তুলি'

আমি যে ল'য়েছি তুলি'—হীন প্রতিভায়,

কোথা রঙ্‌? শুধু কালি— রেখা-পাতে এঁকে' খালি—

আজি সে "প্রাচীন চিত্র" দিলাম তোমায়॥

গুণমুগ্ধ—

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।
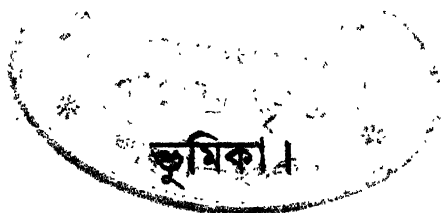
ভূগোলের সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরুচি সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—অণোরণীয়ান্ পল্লীগ্রামে—একজন প্রৌঢ় পুরুষ বাস করিতেন। তিনি হাটে মাঠে কোথাও যাইতেন না, বারোয়ারী দলাদলিতে যোগ দিতেন না, সমাজে কুটুম্বিতায় কাহারও সহিত মিশিতেন না; বহির্জ্জগতের কাছে তাঁহার বড় একটা পরিচয় ছিল না। কূটস্থ চৈতন্যের মত তিনি—একাকী বৈঠকখানার রুদ্ধদ্বার কোটরে—ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রামের বিহগ-নখাঙ্কিত ধূলিময় বিরল পান্থপথে দৈবাৎ চলিবার সময়, প্রতিবেশীরা তাঁহার অধর-চুম্বিত গড়গড়ার শব্দ শুনিয়া মানুষের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিত। তাঁহার সম্মুখে গিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া সেই চিরমৌন-মধুর অপূর্ব্ব সমাধি ভঙ্গ করিবার কাহারও কখনও ইচ্ছা হইত না। দেশের চ'কে তিনি এমনি অবজ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কেবল নারী সমাজে—এই নিথর নির্ব্বাক্ জড়ভরতের একটু আদর ছিল। সকলেই শুনিয়া থাকিবেন—স্মৃতি শাস্ত্রের অনুশাসনে—বঙ্গের রমণীবৃন্দ স্বহস্তে কখনও কুষ্মাণ্ড ছেদন করেন না। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য গৃহলক্ষ্মীরা পুরুষেরই সাহায্য লইয়া থাকেন। মেয়ে-মানুষ কুমড়া কাটিলে তাহার নাকি পুত্র-নাশে। ভবিষ্যতি! এদিকে অন্নচিন্তার সমস্যা সমাধানের জন্য, বাটীর পুরুষ অভিভাবককে প্রায়ই বাহিরে থাকিতে হয়। কাজেই কুমড়া কাটিবার আবশ্যক হইলে বাটীর গৃহিণী এই নিষ্কর্ম্মা

ভূমিকা—লেখকের স্বাধীন মতামতের জন্য গ্রন্থকারকে কেহ যেন দায়ী না করেন।

প্রকাশক।

পুরুষটীকেই ডাকিয়া লইয়া যাইতেন। তিনিও মেয়ে-মানুষের অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিতেন না। বরং পল্লীবাসিনীদের কুমড়া কাটিয়া দিয়া আপনার মধ্যে আপনি বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেন, সে আনন্দে তাঁহার চাপল্যহীন স্তব্ধ হৃদয়ের সকল শূন্যতা ভরিয়া উঠিত; তিনি যে কখনও কাহারও কাজে লাগিতে পারেন—তাহা তিনি একেবারেই জানিতেন না, সুতরাং তাঁহার দেহ ধারণের যে একটা প্রয়োজন আছে, এটুকু জানিয়া, রমণী-সমাজের নিকট তিনি আপনাকে চিরকৃতজ্ঞ ভাবিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। যাঁহার কুমড়া কাটিবার দরকার হইত, সে অকুণ্ঠচিত্তে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত। তিনিও কুমড়া কাটিয়া দিয়া পরোপকারের আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন।

এইরূপে—সেই পল্লীগ্রামের কুল-লক্ষ্মীদের কাছে—তিনি কুমড়া-কাটা বটুঠাকুর নামে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সাহিত্য-সংসারে আমি এখন সেই "কুমড়া-কাটা বটুঠাকুর"। আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, খ্যাতি নাই, অর্থ নাই, শক্তি নাই, সাধনাও নাই, আছে কেবল শীর্ণ দেহে জীর্ণ প্রাণ, আর সেই প্রাণের পর্ণকুটীরের মৃন্ময়ী বেদীর উপর চিন্ময়ী মা'র জন্য ভক্তির কুশাসন পাতা। আমার দর্প দম্ভ শ্লাঘা—আমি আশৈশব বঙ্গ ভারতীর সেবা করিয়া আসিতেছি। মাতৃভাষার সেবা—আমার নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতির অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাই নেহাৎ অমানুষ হইলেও সাহিত্যের মন্দিরে—কুমড়া কাটিবার জন্য আমার ডাক্ পড়ে। আমিও গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া পুরুষত্বের অভিমান চরিতার্থ করি। এইরূপে—আমার ইহপরকালের কায এক সঙ্গেই হইয়া যায়।

কিন্তু আজ আমি যাঁহার আহ্বানে—কুমড়া কাটিতে বসিয়াছি—তিনি বঙ্গবাণীর একজন প্রসিদ্ধ পূজারি। আমার মত স্বেচ্ছাসেবক নহেন। তাঁহার এই "প্রাচীন চিত্রও" পুরাতন প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি

নহে। পণ্ডিত শ্রীযুত রাম সহায় বেদান্তশাস্ত্রী—বাঙ্গালী পাঠকের কাছে—সুপরিচিত। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বেই বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই "প্রাচীন-চিত্রের" আলেখ্যগুলি—"মানসী ও মর্ম্মবাণী" "নব্যভারত" "অর্চ্চনা" "সাহিত্য-সংহিতা" "শাশ্বতী" ও "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সাহিত্য-পরিষৎ', 'সাহিত্যসভা', "সাহিত্যসম্মিলন", "বারাণসী সাহিত্যপরিষৎ" এবং 'বঙ্কিমসাহিত্য-সম্মিলনী' প্রভৃতি বিবিধ সম্মেলন-প্রতিষ্ঠানে—পঠিত হইয়া সহস্র কৌতূহলী শ্রোতাকে আনন্দ দান করিয়াছিল। সেই গুলিই আজ সম্প্রতি গ্রন্থাকারে পাঠকের সঙ্গে পুনঃ-সম্ভাষণ করিতে অগ্রসর। সুতরাং 'প্রাচীন চিত্রের' পরিচয় দিতে যাওয়া আমার পক্ষে লণ্ঠন জ্বালিয়া চাঁদ দেখানো। জানিয়া শুনিয়া সে বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন কি? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি—"কাঁটালপাড়ার" উর্ব্বরা ভূমিতে উপ্ত হইয়া যে প্রতিভা "অবকাশে" অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহাই ফলে ফুলে শোভিত বিরাট্ বনস্পতির আকার ধারণ করিয়াছে। আমি বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়কে বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই বলিয়া জানিতাম, অথচ নীরস মায়াবাদের ভিতর হইতে তিনি যে কাব্যরসের মধু আহরণ করিয়াছেন, তাহা যেমন স্বচ্ছ তেমনি স্বাস্থ্যকর। কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া, দার্শনিকের বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে র‍্যাফেলের অপরাজেয় তুলিতে—শৃঙ্খলানিপুণ পাকা হাতে তিনি ওই "প্রাচীন চিত্র" বাঙ্গালার 'ক্যান্‌ভাস-ফলকে' অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্য সুন্দরীগণের মৃদু-কথা, চাপাহাসি, গোপন-কটাক্ষ, চরণধ্বনি, এমন কি বাসনাবিদ্ধ ব্যর্থ যৌবনের লালসাটুকু পর্য্যন্ত—তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। তিনি যেন কালিদাস, ভবভূতি ও বাণভট্টের প্রত্যেক বাক্যের উপর পাহারা দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে 'ওত্' পাতিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তা-প্রবণতা ও রসানুভাবকতা সত্যই অভিনব। বেদান্তশাস্ত্রী

মহাশয়ের অপূর্ব্ব লিপি-কৌশলে—চির পুরাতন নায়িকাগণ নবরাগে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ—সমালোচনায় তুলাদণ্ডে নারী-চরিত্রের পরিমাণ করিতে গিয়া তিনি যেরূপ জটিল দুর্ব্বোধ্য গুরুতর সমস্যার সহজ মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ; অন্ততঃ আমি কোথাও পড়ি নাই। "প্রাচীন চিত্রের" লেখক, সাগর ছেঁচিয়া, মাণিক তুলিয়া—তাহারই রক্তরাগ-দীপ্তির উজ্জ্বল 'রোশ্‌নি'তে বীণাপাণির যে আরতি করিয়াছেন, আমাদের মাতৃভাষার মঙ্গলের জন্য তাহাই শুভ স্বস্ত্যয়ন। অতীতের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি তাঁহার কথায় আমাদের মনে পড়িয়া গিয়াছে। আমি জোর গলায় বলিতে পারি—বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়—একজন ভাব-বিভোর বৈজ্ঞানিক; হৃদয়-তত্ত্বের অভিজ্ঞতায় তিনি বৈদিকের মত সমদর্শী, তান্ত্রিকের মত সৃষ্টি-কুশলী, আচার্য্যের মত রহস্যবিদ্ এবং বৌদ্ধের মত বিশ্ব-প্রেমিক।

আমরা তখন পাঠশালায় পড়ি। কদমতলায় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের ভবনে—দুই বেলা সাহিত্যের দরবার বসে। আমরা অনেক বালক খেলা করিতে করিতে দরবারে সাহিত্যরথীদের মন্তব্য শুনিয়া ধন্য হই। সেই সময় একদিন একখানি সর্ব্বগ্রাসী সংবাদপত্রে সাহিত্যসেবী কথাটা পড়িয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—সাহিত্যসেবী মানে কি? অক্ষয়চন্দ্র হাসিতে হাসিতে আমায় বলিয়াছিলেন—"তুমি বল দেখি, অহিফেন-সেবী মানে কি?" চুঁচূড়ায় খেকশিয়ালী তখন অহিফেনের লীলাক্ষেত্র, আমি অহিফেনের অর্থ জানিতাম। তৎক্ষণাৎ আচার্য্যের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম—যে আফিং খায়, তাহাকে অহিফেন-সেবী বলে। আমার মুখের দিকে চাহিয়া আচার্য্য বলিয়াছিলেন,—"তাহা হইলে—সাহিত্য সেবী মানে যে, সাহিত্যের মাথা খায়।" অবশ্য আচার্য্য কথাটা রঙ্গ করিয়াই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি—মহাপুরুষের মুখের মহাবাক্য কোমল কৌতুক হইলেও অধুনা কঠোর সত্যে পরিণত হইয়াছে। আজ

কাল যাঁহারা সাহিত্যের মাথা খাইতেছেন, তাঁহারাই 'সাহিত্য-সেবী' আখ্যা পাইতেছেন। এই সকল ধুরন্ধরদের লৌহ-লেখনী—প্রভাস তীর্থের কুল-নাশন মুষল! হিন্দুত্বের বিরাট্ যদুবংশ ধ্বংস না করিয়া সে মুষল ক্ষান্ত হইবে না। জানিনা, জীবন রথের-সারথি নারায়ণের মনে কি আছে। আজকালের অসার 'ছাইত্ব' ছাইকলজির দোহাই দিয়া সতীত্বকে কুসংস্কার বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। সাহিত্যের এই দুঃখ-দুর্গতির দিনে—বঙ্কিম-প্রতিবোসী "বঙ্কিম চতুষ্পাটীর" অধ্যাপক বঙ্কিমসাহিত্য সম্মিলনীর সম্পাদক—বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় যে পুরাতন ভাবধারা বজায় রাখিয়াছেন,—বাস্তবিক এটুকু আমাদের গর্ব্বের কথা। তাঁহার সাহিত্য-সেবা সফল হইয়াছে। তিনি আদর্শ সাহিত্য-সেবী, তাঁহার ভাষা স্বর্গ-বীণার স্থায় ঝঙ্কারময়ী। সাহিত্যের শ্রীভ্রষ্ট শ্মশানে—যেখানে পিশাচেরা করতালি দিতেছে, প্রেতিনী অট্ট হাসিতেছে, শৃগালের সমবেত কণ্ঠে অশ্রাব্য 'কোরাস্' ছুটিতেছে, সেখানে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রামসহায়ের আশীরুত্তোলিত অভয় হস্তই আমাদের ভরসা। প্রাচীন চিত্রের অলোক-সামান্ত বর্ণচ্ছটায় আমি—অরুণ-কিরণে শুভদিনের সূচনা দেখিতে পাইয়াছি। এই ক্ষুদ্র ভূমিকা সেই কৃতজ্ঞতারই কৈফিয়ৎ, মোসাহেবের স্তুতি-স্তব্ধ বাঙ্ময়তা নহে।

চুঁচুড়া
১৯।৯।৩২

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৩	শকুন্তলা সহ	শকুন্তলাসহ
৯	২০	ঢল	চল
১১	১৪	নুতন	নূতন
১১	১৭		
১৩	১৭	শকুন্তলা	শকুন্তলা
১৭	৬	তপোবনে-	তপোবনে—
১৭	৪	অনসূয়া	অনসূয়া
১৮	৬	যে	যে
১৮	২	শকুন্তলা	শকুন্তলা
১৯	২	তপস্বি কন্যাগণের	তপস্বিকন্যাগণের
১৯	২২	প্রস্থানোদ্দ্যোগ	প্রস্থানোদ্যোগ
২১	৪	বলিল	বলিল—
২১	১২	শকুন্তলার প্রেম গীতিকা	শকুন্তলার প্রেম-গীতিকা
২২	৪	জাতীর	জাতের
২৫	২	একাপ্রাণা	একপ্রাণ
২৮	৯	শরীর লাবণ্য।"	শরীরলাবণ্য।"
২৮	১৮	বাহু দুটী	বাহুদুটী
৩২	১০	চক্ষু কোণলগ্ন	চক্ষুকোণলগ্ন
৪২	১৫	কটাক্ষ-কাদম্বরী	কটাক্ষ কাদম্বরী
৪৭	১৭	মহাশ্বেতা-প্রিয়দেহ	মহাশ্বেতা প্রিয়দেহ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	১	অতপ্তা	আতপ্তা
৫০	২১	কিন্তু	
৫২	১৪	সে	কবি
৫৩	৭	এই	অষ্টাবক্র
৫৯	১৬	জম্ভক	জৃম্ভক
৬০	১১	আসি	আদি
৭৩	১৭	ব্রাহ্মণ শিশু"	ব্রাহ্মণশিশুঃ"
৭৫	১৪	বিস্তৃপ্তক্ষণা	বিস্তৃতক্ষণ
৮৬	১০	মূর্চ্ছা দশনে	মূর্চ্ছাদর্শনে
৯২	৬	বদ্ধস্বয়া	বদ্ধস্বয়া
৯৫	২০	অনুতাপের ও	অনুতাপেরও
৯৬	১০	বদ্ধ	বদ্ধ
১০৫	১৮	মুখের মত	মুখশ্রীর মত
১০৬	২৩	এবং	"—এবং
১১১	২৩	দর্পনির্কষঃ	দর্পনিকষঃ
১১৫	১০	সুমন্ত্র	সুমন্ত্র
১২৩	২৩	গর্ভগ্রন্থি ও	গর্ভগ্রন্থিও
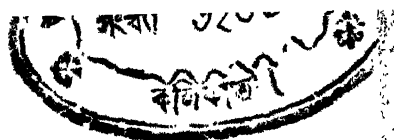
প্রাচীন চিত্র

প্রথম খণ্ড

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা লইয়াই শকুন্তলা। তপোবনবাসিনী শকুন্তলার স্বভাবসরল কোমল ভাবই অনসূয়া। দুষ্মন্তমহিষী শকুন্তলার আহার্য্য-শোভাময় উজ্জ্বলভাবই প্রিয়ম্বদা। অনসূয়া-ভাবে শকুন্তলা হাব-ভাব-বর্জ্জিতা, আশ্রমবাসিনী কিশোরী। প্রিয়ম্বদা-ভাবে শকুন্তলা হাবভাবময়ী, বিলাস-বিভ্রমবতী তরুণী। শকুন্তলা বর্ত্তমানে যেন অনসূয়া; ভবিষ্যতে যেন প্রিয়ম্বদা। চিৎ-শক্তি ও অচিৎশক্তি না বুঝিলে যেমন মহাশক্তিকে বুঝা যায় না; তদ্রূপ অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা-ভাব না বিশ্লেষণ করিলে শকুন্তলা চরিত্রটিও বোঝা যায় না। শকুন্তলার প্রস্থানের পর অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার কথা কবি কিছু বলেন নাই বলিয়া যে ইহারা কবির উপেক্ষিতা, আমরা এমন কথা বলি না। কেন, তাহা পরেই পরিস্ফুট হইবে।

কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকে শকুন্তলা মূল নায়িকা। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা উপনায়িকা মাত্র। অনসূয়ার মধ্যে মুগ্ধা নায়িকার ভাব। সে স্বভাবত সরলা, কোমল-প্রকৃতি অথচ মৃদু-লজ্জাশীলা; প্রীতির বিকচ-

কুসুম। পূর্ণচন্দ্র-প্রভা মূর্ত্তি ধরিয়া যেন ধরাতলে অবতীর্ণা; নবস্ফুট মল্লিকার মতই পরিমলময়ী। অসূয়াশূন্যা তাই, অনসূয়া। ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা, গুণেও দোষারোপ, কাপট্য, ছলনা ও কৌটিল্য এখানে অসূয়ারই মধ্যে।

প্রিয়ম্বদার মধ্যে মধ্যা নায়িকার ভাব। 'প্রারূঢ়স্মরযৌবনা' 'প্রগল্ভ বচনা' 'মধ্যম ব্রীড়িতা' "মধ্যা"। স্বভাবত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, অতিচতুরা; রসের অধিদেবতা। নবোদিত সূর্য্যরশ্মি যেন শরীরিণী হইয়া সঞ্চরমানা। পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মিনীর মতই সৌরভময়ী; প্রিয়বাদিনী বলিয়াই প্রিয়ম্বদা। রসময়ী বাণী প্রণয়ী প্রণয়িনীর কর্ণে মধু বর্ষণ করে। মানসিক অবস্থাভেদে কখন অনসূয়ার উপযোগিতা, কখন বা প্রিয়ম্বদার উপযোগিতা। কানন-রাণীর স্নিগ্ধ শ্যাম দিক্‌টিও যেমন মধুরদর্শন, পক্ষীকূজন-মুখরিত দিক্‌টিও তদ্রূপ শ্রুতিসুভগ। সংসারে দুই-ই আবশ্যক।

অনসূয়া।

অনসূয়া আশ্রমের শান্তিময়ী লক্ষ্মী। প্রিয়ম্বদা নগরের ভোগময়ী সম্রাজ্ঞী। একটি তরুচ্ছায়া-স্নিগ্ধা বন-নদী ধীরে ধীরে নীরবে বহিয়া যায়। অন্যটী বর্ষার রঙ্গভঙ্গে নৃত্যশীলা গিরিনদী সবেগে সগর্ব্বে ছুটিয়া চলে। একটি জ্যোৎস্না মধুরা শারদীয়া রজনী। অপরটি আলোক-দীপ্তা প্রভাতছবি। একটি ভাবপ্রধানা কর্ম্মময়ী বালা। দ্বিতীয়টি কর্ম্মপ্রধানা ভাবময়ী রমণী।

অনসূয়ার সৌন্দর্য্য বড় কোমল, "ব্রীড়াসঙ্কুচিত,'—তাহাতে মাধুর্য্য আছে কিন্তু দাহ নাই। সে সৌন্দর্য্যে মানব মুগ্ধ হয়, কিন্তু পুড়িয়া মরে না। দেহে যৌবনের শ্যাম সুষমা কিন্তু মুখখানি বালিকার মত। যেমন

নির্ম্মল, তেমনই সরল, চাতুর্য্যশূন্য। অনসূয়ার প্রীতি বালচন্দ্র-জ্যোতির মত সুমধুর ও সুশীতল। সে প্রীতি হৃদয়ের বিশ্রাম। তাহাতে খেলার সাধ মেটে কিন্তু তাহা জীবনসংগ্রামে সহায়রূপা হয় না ; অবসন্ন হৃদয়ে উদ্দীপনা আনে না। তাহা স্বপ্নের মত, আবেশের মত। যেন এ কঠিন পৃথিবীর নহে। সে কৃষ্ণতার স্থির চক্ষুতে বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণচকিত কটাক্ষ খেলে না। তাহা তপোবনশ্রীর মতই প্রশান্ত, মন্ত্রপূত বারির মতই পবিত্র। সঞ্চারিণী পল্লবিণী লতার মত তাহার গতি, কিন্তু তাহা হেলিয়া দুলিয়া চলে না। গজগতির সহিত তাহার তুলনা হয় না। বস্তুত কোমল মকমলের আস্তরণেই তাহা শোভা পায়। তাহার রক্তিম অধরে স্বচ্ছ হাসিটি চন্দ্রকর-রশ্মির মত সংমূর্চ্ছিত, বড়ই মিষ্ট, বড়ই কোমল। সে হাসির মধ্যে, যুবতীর লালসা নাই, চতুরার কুটিলতা নাই, বিলাসিনীর ছলাকলা নাই। তাহা অমৃতের মত পবিত্র, শিশুর মত নিষ্কলঙ্ক, মুক্তাফলের মত লাবণ্যময়। অনসূয়া কথা কহে, যেন বীণা ঝঙ্কার দেয়। তাহাতে সরলতা ও মাধুর্য্য যেন উচ্ছলিত হয়। সে যেন 'শ্রমাবসানে বিশ্রান্তির' মত, যুদ্ধ শেষে শান্তির মত।

প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদার সৌন্দর্য্য পূর্ণপ্রস্ফুট, তরঙ্গান্দোলিত শতদলের মত। তাহাতে সুবাসও আছে, মত্ততাও আছে। সে সৌন্দর্য্যালোকে মানব মুগ্ধও হয়, আবার দগ্ধও হয়। প্রিয়ম্বদার হৃদয়ে গোলাপের সৌরভ, যুথিকার কোমলতা, পদ্মবৃন্তের কর্কশতাও বিদ্যমান। যেমন সে রস-ভাবজ্ঞা, ব্যঙ্গ-পরায়ণা, তেমনই মধুর-হাসিনী, প্রিয়বাদিনী। সে যেমন প্রেমগীতির মত মনোহারিণী, তেমনই ভেরীধ্বনির মত উদ্দীপনাকারিণী। তাহার প্রাবৃট নদীর স্রোতের মত বাহ্যত চঞ্চল, দৃশ্যতঃ কথঞ্চিৎ আবিলতাময় ;

কিন্তু অভ্যন্তরভাগ যেমন শীতল, তেমনই স্বচ্ছ। তাহার দ্বারা ভালবাসার সাধ মেটে, খেলার সুখ চলে, আবার লালসা-ক্ষুধারও শান্তি হয়। শ্রান্ত হৃদয়েরও বিশ্রাম, জীবনযুদ্ধেও সহায়রূপা। একাধারে জাগরণ ও স্বপ্ন। তপোবনের পবিত্রতার সঙ্গে রাজান্তঃপুরের রসভাব-চাতুর্য্যের মিলন প্রিয়ম্বদাকে এক অপূর্ব্ব শ্রীসম্পৎ দান করিয়াছে। তাহার ভালবাসা মধুর অথচ উন্মাদক; কোমল অথচ তীব্র। তাহার দৃষ্টি সরল অথচ অন্তর্ভেদিনী; প্রেমে ঢলঢল, রাঁঙ্গে জলজল সে দৃষ্টি "বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ-মেঘবৎ চঞ্চল"। তাহার ভঙ্গীটি "লীলাময়ী," সঙ্গীতমধুরা, সম্রাজ্ঞীরই উপযুক্ত। হাসিটি জোৎস্নাকর-দীপ্ত, সুন্দর; দর্শনমাত্রই মন-প্রাণ হরণ করে। সে হাসির ভিতরে বাহিরে রসতরঙ্গ দিবারাত্রই বহে; মুক্তাফলের মত অনবরতই ফুটে। তাহার বাণী রসময়ী, আনন্দময়ী ও প্রেমময়ী। যাহাতে পড়ে, তাহাই সরস হইয়া উঠে। প্রিয়ম্বদা হৃদয়ের বিশ্রান্তি, অবসাদের উন্মাদনা, বীরত্বের উদ্দীপনা। স্বর্গের সুখ, চিত্তের ভোগ, ভালবাসার বিলাস।

অনসূয়া।

অনসূয়া প্রকৃতির দুহিতা, সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি। চাতুর্য্য জানে না, হাবভাব বিলাস বিভ্রম কিছুই শেখে নাই। কথার মধ্যে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণবাণ কিরূপে যোজনা করিতে হয়, তাহাতে সে অভ্যস্তা নহে। তাহার প্রাণটি ছলাকলা-শূন্য, সহানুভূতিময়, তাই শকুন্তলা যাহা কিছু মনের কথা নির্ভয়ে অসঙ্কোচে অনসূয়াকেই কহে; বক্ষের বল্কল মোচন করিবার জন্য অনসূয়াকেই অনুরোধ জানায়।* প্রিয়ম্বদার উপর কৃত্রিম রাগের ভাণ

* সখি অনসূয়ে, বড় শক্ত করিয়া প্রিয়ম্বদা আমার বক্ষে বল্কল আঁটিয়া দিয়াছে। তুমি শিথিল করিয়া দাও।

করিয়া লজ্জাকোপ-জড়িত নেত্রে অনসূয়াকেই কহে "অনসূয়ে, আমি চলিলাম।"

আশ্রমের নূতন তরুগুলিতে জল দিবার জন্য শকুন্তলা সহ অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা উপস্থিত। তিনজনের কক্ষে ক্ষুদ্র সেচন-কলস; অধরে মৃদু হাসি, ললাটে স্বচ্ছ স্বেদবিন্দু। তিন জনের বয়স প্রায় সমানই। তন্মধ্যে অনসূয়া কিছু ছোট, প্রিয়ম্বদা সামান্য বড় মাত্র। প্রিয়ম্বদা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত, অভিন্নহৃদয়া সখীর মতই শকুন্তলাকে ভালবাসে। আর অনসূয়া মুগ্ধা কিশোরী, নববধূর মতই (ঠিক উপমান না হইলেও) শকুন্তলায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। অনসূয়ার ভালবাসা কত গাঢ়, সহানুভূতি কত গভীর, মনোভাবটি কত কোমল—তাহা তাহার প্রথম কথাটিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

"সখি শকুন্তলে, পিতা কণ্ব তোমার চেয়ে আশ্রমের তরুগুলিকে অধিক ভালবাসেন; নতুবা নব মল্লিকার মত কোমলা তোমাকে আলবাল-পরিপূরণে নিযুক্ত করিবেন কেন" ?

কি মধুর কোমল বাণী! বাণীর ভিতর দিয়া অনসূয়ার কোমল মূর্তিখানি যেন সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলা যখন উত্তরে বলিল,—"সখি শুধু পিতার নিয়োগ বলিয়া নহে, ইহাদের উপর আমার সহোদরের স্নেহ আছে।" অনসূয়া সে কথার আর প্রতি-উত্তর করিল না; নিঃশব্দে জলসেচন করিতে লাগিল।

প্রিয়ম্বদা যখন জিজ্ঞাসা করিল—"অনসূয়ে, জান কি, শকুন্তলা কেন বনতোষিণীকে এত আগ্রহভরে দেখিতেছে?" অনসূয়া সরলপ্রাণা, অত সে বুঝে না; প্রিয়ম্বদার বাক্‌চাতুরীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার সাধ্য কি? অনুরূপ উত্তরও দিল—"আমি জানি না।"

রাজা দুষ্মন্তের গম্ভীর আকৃতি দেখিয়া, স্নিগ্ধ মধুর রসালাপ শুনিয়া,

ঐশ্বর্য্য ও দাক্ষিণ্যের অপূর্ব্ব সন্নিবেশ লক্ষ্য করিয়া প্রিয়ম্বদার জানিতে ইচ্ছা হইল—"ইনি কে ?" প্রিয়ম্বদা সে ইচ্ছাটি দমন করিল। অনসূয়া কিন্তু সে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া একেবারেই পরিচয় জানিতে চাহিল। সে জিজ্ঞাসার মধ্যে ঋষিকন্যাগণের সুসভ্যতা, শিষ্টাচার, সদালাপ এবং সুশিক্ষার প্রভাবই পরিস্ফুট।

"আর্য্যের মধুরালাপজনিত বিশ্বস্ততাই আমাকে আলাপে মুখর করিয়া তুলিয়াছে। আর্য্য, কোন্ রাজর্ষিবংশ আপনার দ্বারা অলঙ্কৃত, কোন্ দেশ সম্প্রতি বিরহোৎকুষ্ঠিত, কি নিমিত্তই বা এমন সুকুমার আত্মাকে আপনি তপোবনাগমন-শ্রমে উপনীত করিয়াছেন ?" পরিচয় লইবার ভঙ্গীটি বস্তুতই বড় সুন্দর। ইহার মধ্যে কৃত্রিম আদবকায়দা নাই, যুবতীজনোচিত ছলাকলা নাই। ইহা অকৃত্রিম হৃদয়ের স্বতোনিস্থৃত বাণী। কে বলিবে, প্রাচীনকালের রমণীরা শিক্ষাদীক্ষাহীনা এবং শিষ্টাচার শূন্যা ছিলেন ?

রাজা শকুন্তলার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। বাঙ্‌নিপুণা রসিকা প্রিয়ম্বদা সে পরিচয় দিল না। সে পরিচয় দিবার কালে কি বাধা উপস্থিত হইবে, তাহা সে পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। এবারও অনসূয়াই সে পরিচয় দিতে বসিল—

"রাজর্ষি বিশ্বামিত্রই সখীর জনক। তাত কণ্ব প্রতিপালক পিতা মাত্র। তপস্যারত বিশ্বামিত্র বসন্তোদয়-কালে অপ্সরা মেনকার উন্মাদক রূপ দেখিয়া"—এইরূপে অসঙ্কোচে শকুন্তলার জন্ম ব্যাপার বলিতে গিয়া নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক লজ্জার জন্য অনসূয়া আর বলিতে পারিল না, মধ্যপথেই থামিয়া পড়িল। এ লজ্জা স্বভাবসরলার পক্ষেও স্বাভাবিক। বয়সের ধর্ম্মে, সুশিক্ষার গুণে, শকুন্তলার মত ভাবপ্রবণা এবং প্রিয়ম্বদার মত রসভাবজ্ঞার সাহচর্য্যে তাহার স্বাভাবিক লজ্জাটুকু আরও বৃদ্ধি

পাইয়াছে। শকুন্তলার মত সঙ্গিনী পাইয়াছিল, প্রিয়ম্বদার মত সখী লাভ করিয়াছিল আর তপোবনের রমণীধর্ম্ম-শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াছিল বলিয়াই অনসূয়া "মিরন্দা" হইয়া উঠে নাই। অনসূয়ার অবস্থায় কখন "মিরন্দা" ফুটে না। তপোবন ত আর নির্জ্জন দ্বীপ বা জনশূন্য অরণ্যানী নহে যে, তথায় স্বভাবের বন্য ভাবটি ফুটিতেই হইবে।

শকুন্তলা যখন অনসূয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"সখি অনসূয়ে, নূতন কুশসূচিতে আমার চরণ ক্ষতবিক্ষত, কুরুবকতরু-শাখায় আমার বল্কল পরিলগ্ন হইয়াছে। অপেক্ষা কর, আমি ছাড়াইয়া লই।" অনসূয়া অমনই দাঁড়াইল; সে অতশত বুঝিল না। প্রিয়ম্বদা বোধ করি, তখন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; তাই তাহার মুখে এমন সময়ে কোন সরস রসিকতা ফুটিতে দেখিলাম না।

দুষ্মন্ত-বিরহে শকুন্তলা কাতরা; বেতসলতা-কুঞ্জের কুসুমাস্তরণে সে শয়ানা। শরীরের তাপ এত অসহ্য, মন এত তন্ময়—সখীরা যে বাতাস দিতেছে, তাহার উদ্বোধ পর্য্যন্ত নাই। শকুন্তলার অসুস্থতার মূল কি, প্রিয়ম্বদা সম্পূর্ণই বুঝিয়াছিল। অনসূয়া একটা ক্ষীণ আশঙ্কা করিয়াছিল মাত্র। আর সে আশঙ্কা জন্মিবারও হেতু—অনসূয়ার শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিক ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ। দুষ্মন্ত-বিরহেই সখী আমাদের এই দুঃখময়ী অবস্থায় নিপতিতা হইয়াছে—প্রিয়ম্বদার মুখে এই কথা শুনিয়া তবে সে বুঝিতে পারিল।

অনসূয়া যদিও প্রকৃতির দুহিতা, স্বভাবসরলা, কিন্তু সে রীতিমত নারীধর্ম্ম-শিক্ষায় শিক্ষিতা। ইতিহাস-কথাপ্রবন্ধে তাহার সম্যক্ অধিকার বর্ত্তমান। ইহা তাহার মুখের কথাতেই প্রকাশ।

"সখি শকুন্তলে, তোমার মনোগত ভাবটি কি, তাহা সবিশেষ অবগত নহি। তবে ইতিহাস-কথাপ্রবন্ধে কামিগণের অবস্থা যাহা অবগত

হওয়া যায়, তাহাতে তোমার সেই অবস্থাই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বল সখি, কি নিমিত্ত তোমার এ আয়াস? রোগ না জানিলে চিকিৎসা কি করিব?"

শকুন্তলা স্ব-মুখে রোগটি ব্যক্ত করিল, তাহার প্রশমনোপায়টিও বলিয়া দিল। প্রার্থনা জানাইল "তোমরা যাহা ভাল বোঝ, তাহাই কর। তবে আমি যাহাতে সেই রাজর্ষির অনুকম্পার পাত্রী হই, তাহা দেখিও। নহিলে আমি শুধু তোমাদের স্মৃতিপথেই রহিয়া যাইব।" প্রিয়ম্বদাই তখন জনান্তিকে অনসূয়াকে কহিল "অনসূয়ে, আকাঙ্ক্ষা চরমে উঠিয়াছে, আর কাল হরণ করা চলে না।" তখন শকুন্তলার দুঃখে অনসূয়ার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; সেই কাতর প্রার্থনায় তার মনোতন্ত্রীতে একটি করুণ রাগিণী বাজিল। সে একেবারেই তাড়াতাড়ি ব্যগ্রস্বরে প্রিয়ম্বদাকে ধরিয়া বসিল—

"প্রিয়ম্বদে, কি উপায় হইবে? কি উপায়ে বিরলে সত্বর সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যায়?" সরলপ্রাণা অনসূয়াতে সংসারের কুটিলতা এবং পাপ এখনও স্পর্শ করে নাই। তাই তাহার সরল নিষ্পাপ মনে কোনরূপ কুণ্ঠা, সঙ্কোচ দেখা দিল না, কোন প্রকার তর্কবিতর্ক উত্থিত হইল না। অনসূয়া শকুন্তলায় মিশিয়াই আছে। "তদ্গতপ্রাণা হি সা।"

প্রিয়ম্বদা বুঝাইল—বিরলে—ইহাই চিন্তার বিষয়। সত্বর—ইহা দুষ্কর নহে। ইহার অর্থও অনসূয়া বুঝিল না। প্রিয়ম্বদা বুঝাইয়া দিলে তবে সে বুঝিল। রাজাও যখন প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ; তখন সমাগম কিছু দুষ্কর নহে। কিন্তু নির্জ্জনে সমাগম—তাহাই ভাবনার বিষয়। কেবল যে স্থান নির্ব্বাচনেরই কৌশল করিতে হইবে, তাহা নহে। নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করান উচিত কি না, তাহার পরিণাম ফল কি—এই সকল ভাবনাই প্রিয়ম্বদার মনে জাগিল। অনসূয়া ও সকল বুঝিয়া, অত ভাবিয়া কার্য্য করে না।

যখন যেটি বলা আবশ্যক বা করা প্রয়োজন, তাহাই তৎক্ষণাৎ সে বলে এবং করে। কথা চাপিয়া রাখিতে সে জানে না, চাহেও না। দেবসেবা-চ্ছলে পুষ্পরাশির মধ্যে করিয়া পত্র পাঠাইবার কৌশল অনসূয়ার মাথায় আইসে নাই। তবে সে অসঙ্কোচে পত্রখানি দুষ্মন্তের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে প্রস্তুত।

রাজা দুষ্মন্ত সেই বেতসলতা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছেন। সখী শকুন্তলার চক্ষুতে ও অধরে শৃঙ্গার-লজ্জার লুকোচুরীও আরম্ভ হইয়াছে। রাজাদিগের তখনকার কালে বহু পত্নী থাকা নিয়ম ছিল। শকুন্তলা যাহাতে রাজার প্রণয়পাত্রী হইয়া প্রধানা মহিষী হয়—সেই আকাঙ্ক্ষা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা করিবেই। কিন্তু এখানেও অনসূয়াই মনের কথা খুলিয়া বলিল, একেবারেই রাজার নিকট অনুরোধ বল, আবদার বল, প্রার্থনা বল, করিয়া বসিল—

"সখী আমাদের যাহাতে বন্ধুগণের অনুশোচনার পাত্রী না হয়, তাহা দেখিবেন।"

দুষ্মন্তশকুন্তলার প্রণয়ালাপের মধ্যে আর থাকা উচিৎ নহে—ইহা অনসূয়ার মাথায় আইসে নাই। সময়াভিজ্ঞা, রসভাবচতুরা প্রিয়ম্বদাই কৌশলে অনসূয়াকে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।*

প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদা প্রকৃতির বধূ। বধূ-উচিত লজ্জা, গোপন ভালবাসা, প্রণয় লুকাচুরী, হাবভাব বিলাস বিভ্রম—সর্ব্ব বিষয়েই সে শিক্ষিতা। অব-

* পাঠান্তরও আছে বটে—অনসূয়াই প্রথম বলে 'চল মৃগশিশুকে উহার মায়ের নিকট রাখিয়া আসি।' প্রিয়ম্বদা উত্তরে কহে 'তুমি একাকী পারিবে না, আমিও যাই'। এ পাঠান্তরটি অনসূয়া চরিত্রের উপযোগী নহে। অনসূয়া সরলভাবে বলিয়াছে, এইরূপে চরিত্রটি বজায় রাখাও যেন কষ্ট কল্পনা হইয়া পড়ে। লেখক।

গুণ্ঠনের অন্তরালে তার স্ফুরণচকিত কটাক্ষ খেলে। অঞ্চল-চাপা হাসির মধ্যে তার মনোভাবটি ফুটিয়া উঠে। শকুন্তলায় যাহা আছে, হস্তিনাপুর-রাজ্ঞী শকুন্তলায় যাহা দেখা দিবে—প্রিয়ম্বদায় তাহাই পূর্ণভাবে দেদীপ্যমান। রাজান্তঃপুরের শাসনকর্ত্রীকে কতদূর চতুরা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে হইবে—তাহারই আভাস প্রিয়ম্বদায় বিদ্যমান।

প্রিয়ম্বদা যেমন স্বভাব-চতুরা, তেমনই সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিতা। মর্ম্মপুটে রুদ্ধ ভালবাসার ক্ষীণ রশ্মিটুকু সে দেখিতে পায়। নবপ্রণয়বতী মুগ্ধা-কিশোরীর আধপ্রেম, আধ লজ্জার লুকাচুরী সে সহজেই ধরিয়া ফেলে। সাত্ত্বিক ভাব—দুরু দুরু কম্প, স্বেদজলস্রব, ভূমিপানে আনত দৃষ্টি এবং লীলাপত্র-চ্ছেদন তাহার চক্ষুতে অজ্ঞাত থাকে না।

শকুন্তলা যখন প্রিয়ম্বদার দোষ দিয়া বক্ষের দৃঢ়বদ্ধ বল্কলটি শিথিল করিয়া দিবার জন্য অনসূয়াকে অনুরোধ করে; তখন প্রিয়ম্বদা হাসিতে হাসিতে বলে—

"এস্থলে পয়োধরবিস্তার-বর্দ্ধক নিজের যৌবনকে তিরস্কার কর; আমার দোষ কি ?"

এই সরস ব্যঙ্গটি সময়োচিত এবং বয়সোচিতও বটে। এই কথাটিতে যে কেবল মিষ্ট রসিকতা এবং নিজ দোষের ক্ষালন মাত্র করা হইয়াছে, তাহা নহে! নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমতৃষা যে বনবাসেও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, যৌবনের রসালাপ যে তপোবনের চতুঃসীমার মধ্যেও ফুটিয়া উঠে, স্বভাবের কোলে পালিতা বনলতিকাও যে উদ্যানলতার গুণ সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়, আশ্রমের বেদসঙ্গীতের মধ্যেও যে প্রণয়-দেবতার গুন্ গুন্ ধ্বনিও শুনিতে পাওয়া যায়—কবি প্রকারান্তরে আমাদিগকে ইহাই বুঝাইলেন। রক্ত-মাংসে গড়া মানবীয় হৃদয় সর্ব্বত্রই সমান। যৌবনের প্রভাব সর্ব্বত্রই অবারিত। শকুন্তলা যে পূর্ণযৌবনা—এ ইঙ্গিতটিও কবি দুষ্মন্তকে জানাইয়া দিলেন।

শকুন্তলা যখন "ঐ চূত তরুটি বায়ু-চঞ্চল পল্লবাঙ্গুলি দ্বারা আমাকে কি যেন বলিতেছে; আমি যাই, উহাকে আদর করি", বলিয়া তরুটির নিকট গেল। তখন প্রিয়ম্বদা মৃদুহাস্তে শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"শকুন্তলে এই তরুটির নিকট তুমি মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া থাক। তুমি সম্মুখে থাকিলে তরুটি লতা-সনাথ হইয়া শোভা পাইবে।

ভিতরে ভিতরে স্বভাব-সুলভ অদম্য প্রেমতৃষাটি যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহমানা তাহা প্রথমেই বুঝা গিয়াছে। *এক্ষণে আবার সেই প্রেমতৃষার উপশমের পাত্রটি সম্বন্ধেও যে—তাহাদের দিব্যজ্ঞান বিগুমান, তাহাই এক্ষণে পরিস্ফুট হইল। শকুন্তলার বিবাহ না হইলে আর মানাইতেছে না, বিবাহের জন্য ঋষিও বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন—তাহাও জানিতে পারা গেল। শকুন্তলার বিবাহের ফুল ফুটিয়াছে, এখন ভ্রমর আসিলেই হয়; তাহারও আর বড় বিলম্ব নাই। প্রিয়াম্বদারও ফুল ফুটিয়াছে; অনসূয়ারও ফুল ফুটিবার অবস্থায় আসিয়াছে।

বনতোষিণী নব-মালিকার অঙ্গে নূতন কুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর সেই নবকুসুম-যৌবনা নবমালিকা আপনার বাহু-বেষ্টনে সহকার-তরুটিকে জড়াইয়া আছে,—শকুন্তলা তাহাই একদৃষ্টে দেখিতেছিল। প্রিয়ম্বদা তাহার মধ্যে এক নূতন সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল "অনসূয়ে জান কি, কেন শকুন্তলা বনতোষিণীকে এত করিয়া দেখিতেছে? দেখ বনতোষিণী যেমন এই সহকার-তরুটিতে সঙ্গতা হইয়াছে, আমিও কি এই প্রকার অনুরূপ বরের সহিত মিলিতা হইতে পারিব?"

প্রিয়ম্বদা রসিকতার মধ্য দিয়া মধুবৃষ্টি করে, হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় রসমাধুর্য্য ঢালিয়া দেয়। শকুন্তলা যখন "প্রিয়ম্বদে, তোমাকে একটি প্রিয় সংবাদ দিই" বলিয়া আমূল-মুকুলিত মাধবী লতাটিকে দেখাইল। বিস্ফারিত-

চক্ষু প্রিয়ম্বদা সহর্ষে তাহা দেখিল। প্রত্যুৎপন্নমতি প্রিয়বাদিনী তৎক্ষণাৎ উত্তরও দিল—"সহি তেন হি পড়িপ্পিঅং দে নিবেদেমি" সখি, আমিও তোমাকে প্রতিপ্রিয় (উল্টাপ্রিয়) সংবাদ দিই। তুমিও "আসন্ন পাণি-গ্রহনা" হইয়াছ। মাধবীলতা আমূল মুকুলিতা—ইহা শুভলক্ষণ। সাধে কি "প্রিয়ম্বদা" প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার কর্ণে রস-সলিলধারা ঢালিয়া দিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতেছিল, কিন্তু সে সলিলধারা যে রাজা দুষ্মন্তের নূতন আশা-বীজটিকে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত করিয়া দিতেছিল—তাহা অবশ্য প্রিয়ম্বদা জানিতেছিল না।

"উহা তোমার নিজেরই মনের কথা" বলিয়া শকুন্তলা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিল। বস্তুত পতিসমাগমের জন্য শকুন্তলা যে লালায়িতা এবং উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। তপোবনের পবিত্রতার মধ্যে যে বাস করে, সে ত আর বিলাসের কোলে পালিতা বিলাসিনী যুবতী নহে যে, বৃষস্যন্তী হইয়া উঠিবে। তবে তাহার সুপরিপুষ্ট নিটোল অঙ্গ, কুসুমিত উন্মাদক যৌবন, প্রেমরসোজ্জ্বল মধুর রসালাপ স্পষ্টই জানাইয়া দিতেছে যে, শকুন্তলার অন্তরের অন্তঃস্থল পতি-সমাগমাশায় ব্যাকুল। শকুন্তলা তজ্জন্য অভাব অনুভব না করুক,—ব্যাকুলা নাই হউক—তবে তাহার আরক্তিম কপোল, বিদ্যুদ্দাম-চকিত কটাক্ষ, মদনের রঙ্গভূমি সমুন্নত বক্ষ যে ব্যাকুল ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার আর সংশয় নাই। সে অধর চুম্বনে ব্যগ্র, সে বাহুলতা আলিঙ্গনে লালায়িত, সে কটাক্ষ সন্ধানে উন্মুখ। আমারাও এক্ষেত্রে বলিতে পারি, "লাবণ্য চঞ্চল কিন্তু লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে"।

প্রিয়ম্বদা যখন শকুন্তলার সেই চুরি করিয়া চাহিয়া দেখাটি লক্ষ্য করিল, প্রিয়বাণী শ্রবণের প্রত্যাশায় তাহাকে উৎকর্ণ থাকিতে

দেখিল ; প্রণয়-কোপ আর শৃঙ্গার-লজ্জার লুকোচুরি ধরিতে পারিল, তখন বুঝিল যে, শকুন্তলা রাজার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। আবার যখন সে শকুন্তলার প্রতি রাজার করুণ সহানুভূতি, পরিচয় জানার অদম্য কৌতূহল, অহেতুক প্রীতির আকর্ষণ লক্ষ্য করিল—তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, মৃগয়াবিহারী সম্রাট আজ হরিণ শিকার করিতে আসিয়া হরিণনয়নার কটাক্ষশরে বিদ্ধ হইয়াছেন। পৃথিবীর মালিক আজি এক বনবাসিনীর প্রভাতিরল সৌন্দর্য্যের ভিখারী সাজিয়া আসিয়াছেন।

প্রিয়ম্বদাই লতাকুঞ্জের মধ্যে শিলাপট্টের উপর পুষ্প-পল্লব বিছাইয়া শকুন্তলাকে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। নলিনীপত্রের বাতাস দিয়া তপ্ত অঙ্গ শীতল করিবার যত্ন লইতেছে। সে বাতাসে ভিতরের তীব্র তাপ কিছুমাত্র শান্তিলাভ করিতেছে না। শকুন্তলা এমতই আত্মবিহ্বলা—সখীরা যে বাতাস দিতেছে, সে জ্ঞানই নাই। কি দুঃখময়ী অবস্থা! প্রিয়ম্বদা সবিষাদে অনসূয়ার প্রতি চাহিল, জনান্তিকে বুঝাইয়াও দিল—

"এ বিকারের মূল রাজর্ষির প্রতি সখীর অনুরাগ। এ বিকারের একমাত্র ঔষধই রাজর্ষি সহ মিলন। এ সমাগম ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই নাই।

রাজা আসিলেন। নিদাঘতপ্তা পৃথ্বী শীতল হইল। নির্ব্বাণপ্রায় দীপশিখা তৈলনিষেকে জ্বলিয়া উঠিল। নির্জ্জীবপ্রায় শকুন্তলা-বল্লরী রাজার অনুরাগ-সলিল পাইয়া ধীরে ধীরে সজীব হইয়া দেখা দিল। রাজা লতাকুঞ্জে, ছায়া-স্নিগ্ধ কুসুম-শয্যায় শায়িতা শকুন্তলার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার মধ্য দিয়া দুইটী হৃদয়ে প্রেমমধুর রসালাপ চলিতে লাগিল। দুষ্মন্ত "উপভোগক্ষম" সহকার, আর শকুন্তলা "নবকুসুম-যৌবনা" মাধবীলতা। সহকার শাখা-বাহু আলিঙ্গনে লতাটিকে বক্ষের উপর টানিয়া লইবার উপক্রম করিতেছে, আর মাধবীলতাটিও তাহার বিস্তৃত বক্ষে আশ্রয় লইবার জন্য কম্পিতা ও উন্মত্তা হইয়া

উঠিয়াছে। "দুইখানি মেঘই বিদ্যুতে ভরা" প্রিয়ম্বদা বুঝিল, এ সময়ে আর থাকা উচিত নহে। মৃগশিশু ধরিবার ছলে প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে লইয়া পলাইয়া গেল।

শকুন্তলা ক্ষত্রিয় রাজর্ষির কন্যা এবং অপ্সরার গর্ভজাতা। দুষ্মন্তও শকুন্তলার স্পৃহনীয় যোগ্য বর। আর দুইজনে দুইজনকে দেখিবামাত্র ভালবাসায় বাঁধাও পড়িয়াছে। ইহাদের মিলনও বিধাতার দান। প্রিয়ম্বদা এই সকল ভাবিয়া, বেশ করিয়া বুঝিয়া তবে উভয়ের অন্তরের উপ্ত বীজটীকে সলিলদানে অঙ্কুরিত করিয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, এই অঙ্কুরিত বীজ শীঘ্রই তরুর আকারে দেখা দিবে। তজ্জন্যই প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার অনিচ্ছাকৃত গমনে বাধা দিয়াছে, এমন কি দূতিগিরি করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই।

শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার পূজার জন্য সখীদ্বয় মালিনীতীরে পুষ্পচয়নে ব্যগ্র, এমন সময়ে "অয়মহং ভোঃ" এক বিকট চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। শকুন্তলা পর্ণশালার অভ্যন্তরে পতিচিন্তায় এমন বিভোর—; তাহারই দ্বারের সম্মুখে সে ধ্বনি—তার কর্ণে একেবারেই প্রবেশ করিল না। শকুন্তলার মনটী তখন কল্পনার লীলায়িত গতিতে হস্তিনাপুরে চলিয়া গিয়াছে। সে ভীষণ শব্দে সারা বনভূমি সন্ত্রস্ত। মালিনী নদী করুণ সঙ্গীত গাহিয়া বহমান। হরিণেরা অর্দ্ধভক্ষিত মুখকবল মুখে করিয়াই রহিয়াছে। পক্ষীরা তরুশাখায় নিস্তব্ধে স্থিরভাবে বসিয়া আছে। সে ভৈরব গর্জ্জন পতিচিন্তায় তন্ময়চিত্তা শকুন্তলার কর্ণে কোন স্পন্দন উঠাইতে না পারিয়া দূর আকাশের গায়ে বিলীন হইয়া গেল।

"ভৈরব গর্জ্জন, মিশে গেল তন্ময়তা সনে—
সিন্ধু বেগ বালুকায় হল প্রবাহিত" *

---

* গ্রন্থকার প্রণীত কাব্য "মালঞ্চ"

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা

সেই সহস্র বজ্র-নির্ঘোষবৎ-ধ্বনি শুনিয়া বহুদূরবর্ত্তিনী অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা চমকিয়া উঠিল। উদ্বিগ্নচিত্ত, স্খলিত চরণ, বিভ্রান্ত চক্ষু লইয়া সখীদ্বয় ছুটিয়া আসিল। দেখে—অগ্নিসম তেজস্বী দুর্ব্বাসা ঋষি ক্রোধারুণ নেত্রে আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন। পদভরে ধরিত্রী কম্পবানা। উঃ, কি বিষম বিপৎ! তখন শকুন্তলার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সহচরীদ্বয় ছিন্নপক্ষ পক্ষিণীর মত দুর্ব্বাসার চরণে লুটাইয়া পড়িল। ক্রোধাবতার ঋষির কঠোর মর্ম্মতারে সমবেদনার একটী ক্ষীণ রাগিণী মাত্র বাজিয়া উঠিল। তপস্বিনী ঋষিকন্যাদের করুণ পরিদেবনে ঋষি এইটুকু মাত্র সান্ত্বনা দিলেন যে, অভিজ্ঞানচিহ্ন দেখাইতে পারিলে তবে শকুন্তলার স্মৃতি দুষ্মন্তের অন্তরে জাগিয়া উঠিবে। পরিণামে এই অভিজ্ঞানচিহ্নই দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলনের কারণ হয়—তাই এই নাটক খানির নাম "অভিজ্ঞান-শকুন্তল"।

চতুর্থ অঙ্কে প্রিয়ম্বদাই অনসূয়াকে সংবাদ দিল যে, তাত কণ্ব শকুন্তলার এই আত্মনিবেদনে বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। অদ্য প্রাতে লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে অভিনন্দিতা করিয়া বলিয়াছেন—

"বৎসে, ভাগ্যবশতঃ "ধূমনিরুদ্ধ-দৃষ্টি" যজমানের আহুতি ঠিক যজ্ঞীয়াগ্নিতেই নিপতিতা হইয়াছে। "সৎশিষ্য-পরিগৃহীতা'' বিদ্যার মত তুমি সার্থক হইয়া উঠিয়াছ। অদ্যই তোমাকে আমি ঋষিগণের সাহায্যে পতিগৃহে প্রেরণ করিব।" এই গান্ধর্ব্ব বিবাহে প্রিয়ম্বদার যে একটুও ভয় ছিল না, তাহা নহে; সে ভয় আজ দূর হইল। শকুন্তলা সুখিনী হইবে, সে সংবাদ প্রিয়ম্বদা তাড়াতাড়ি অনসূয়াকে দিয়া গেল।

সূর্য্যোদয়ে কৃতস্নাতা শকুন্তলাকে তপস্বিনীরা স্বস্তিবাদ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া আসিয়া প্রাণসখীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। একপ্রাণা, নিজেরই প্রতিচ্ছবি-স্থানীয়া সখীদের ছাড়িয়া

যাইতে হইবে- শকুন্তলা কাঁদিতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ঋষিকন্যা, মঙ্গলকার্য্যে রোদন অনুচিত—বলিয়া শকুন্তলাকে সান্ত্বনাও দিল ; আবার নিজেরাও চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে বসিল। স্নেহের প্রকৃতিই এই।

প্রিয়ম্বদা অত দুঃখের মধ্যে লক্ষ্য করিল, শকুন্তলা আর্য্যপুত্র-দর্শনে উৎসুক হইয়াও তপোবন বিরহে বড় কাতরা হইয়াছে। প্রিয়ম্বদা চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল—"উদগীর্ণ-গর্ভকবলা" মৃগী, "পরিত্যক্তনৃত্যা" ময়ূরী, "অপসৃত-পাণ্ডুপত্রা" লতা প্রভৃতিও আজ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। প্রিয়ম্বদার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। গর্ভভার-মন্থরা মৃগবধূ আসিয়া শকুন্তলার সম্মুখে দাঁড়াইল, মাতৃহারা মৃগশিশুটি ধীরে ধীরে শকুন্তলার অঞ্চলাগ্র টানিতে লাগিল। সখীদের শেষ আলিঙ্গন দিয়া শকুন্তলা আশ্রম ত্যাগ করিল।

আর অনসূয়া প্রিয়ম্বদার আবশ্যক নাই। শকুন্তলার তপোবন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ম্বদার কার্য্যও ফুরাইল। রঙ্গমঞ্চে সখীদ্বয়ের আবির্ভাব আর দেখা গেল না।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদা যে যোগ্যপাত্রে সমর্পিতা হইবে—ইহা আমরা ঋষি কণ্বের মুখেই শুনিতে পাইয়াছি। ঋষিকন্যাদের যোগ্যবর যে ঋষিকুমার—এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। ঋষি যে তাঁহার বড় সাধের শকুন্তলার প্রিয়-সখী দুটীকে প্রিয়-শিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের করেই সমর্পিতা করিবেন—ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। শারদ্বতের যোগ্যা অনসূয়া, শার্ঙ্গরবের অনুরূপা প্রিয়ম্বদা। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে আমরা কাদম্বরী কাব্যের পত্রলেখার মত কবির উপেক্ষিতা বলিতে পারি না।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার দুইটী দিক্ মাত্র। অনসূয়া ও

প্রিয়ম্বদাকে ছাড়িয়া দিয়া শকুন্তলার নিজস্ব কিছু আছে কি না, আমরা জানি না। এই দুইটী সখী শকুন্তলারূপা জাহ্নবীকে বিশ্বেশ্বরাভিমুখে স্থির রাখিবার জন্য অসিবরণার মত দুইপার্শ্বে বিরাজমানা। আবার বলি তবোবনবাসিনী শকুন্তলার স্বভাব-সরল কোমল দিকটিই অনসূয়া। দুষ্মন্ত-মহিষী শকুন্তলার "আহার্য্য-শোভাময়" উজ্জ্বল দিকটিই প্রিয়ম্বদা।

কালিদাসের শকুন্তলা।

কালিদাসের শকুন্তলা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তপোবনে-পরিহিতবল্কলা কুসুমাভরণা কুমারী, রাজান্তঃপুরে—মণিরত্নভূষিতা রাজরাণী। আশ্রমের শান্ত সুষমা, নগরের রাজলক্ষ্মী। প্রেমের বিকচ কুসুম, আরাধনার পরিপক্ক ফল। "প্রথমাবতীর্ণ যৌবন-মদন বিকারা," সমধিক লজ্জাবতী, মানে মৃদু, মুগ্ধা নায়িকা।

ঋষির ঔরসজাতা, অপ্সরা মেনকার গর্ভজাতা, তপস্বী কণ্বের পালিতা কন্যার এমন রূপ, এমন প্রভাতরল জ্যোতি, এমন অলৌকিক সৌন্দর্য্য মানুষীতে সম্ভব নহে বলিয়াই কি সে অপ্সরা-সম্ভবা? পিতৃমাতৃ-ত্যক্তা কন্যা, শকুন্ত-পক্ষীর দ্বারা রক্ষিতা হইয়াছিল, তাই নাম শকুন্তলা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এবং অপ্সরা মেনকার কন্যা ক্ষত্রিয়ের বিবাহ্যা হইবে, তাই কি ঋষি তাহাকে সেইমতই সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন? যাহাকে একদিন রাজার মহিষী, ভরতের মত পুত্রের জননী হইতে হইবে, তাহাকে সেইমতই গঠিত করা আবশ্যক। তজ্জন্যই কি দূরদর্শী ঋষি শকুন্তলার উপর আশ্রমের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন? সহস্র প্রজার যে জননী

হইবে—তাহার স্নেহের প্রসার তাই কি তরুলতা ও পশুপক্ষী তাবৎ প্রাণীতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ?

শকুন্তলা সখীদ্বয়সহ স্বপ্রমাণানুরূপ সেচনঘট কক্ষে লইয়া ক্ষুদ্র তরু-গুলিতে জলসেচন করিতেছে ! সে তরুগুলির উপর শকুন্তলার সহোদরের অধিক স্নেহ পড়িয়াছে। শকুন্তলার মধুর-দর্শন রূপসৌন্দর্য্য সে উদ্যানটি আলো করিয়া আছে। দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরালে অবস্থিত থাকিয়া যে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা তাহারা কেহই জানে না। আশ্রমবাসিনী রমণীদের রাজান্তঃপুর-দুর্লভ রূপ দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। এমন-প্রকৃতি-মনোরম দেহ কি কখনও তপস্যার ক্লেশ সহ্য করিতে পারে—মনে করিয়া রাজা ঋষির উপর একটু অনুযোগও করিলেন। শকুন্তলার বক্ষোদেশ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ; অনসূয়া বল্কল শিথিল করিয়া দিলে দুষ্মন্ত দেখিলেন—বল্কলসাজে শকুন্তলা কি সুন্দর ! তাহার পল্লব-রক্তিম অধর, কোমল শাখা-সদৃশ বাহু, কুসুম-লোভনীয় যৌবন কি মনোরম ! যদিও ইহারা তপস্বীর কন্যা, তথাপি যৌবন লইয়া রঙ্গও করে, সহকারের সঙ্গে মাধবীলতার বিবাহও দেয়। রাজার হৃদয়ে আশার ক্ষীণজ্যোতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

শকুন্তলা তপস্বিকন্যা, কিন্তু তপস্বিনী-ভাবাপন্না নহে। নতুবা যৌবন-সম্বন্ধীয় রসালাপ তাহার এত মধুর লাগিবে কেন ? সে প্রবৃত্তিরই সেবিকা—নচেৎ লতাকে স্বয়ম্বর-বধূ করিয়া সহকারের সঙ্গে বিবাহ দিবে কেন ?—আবার সেই লতাকে নবযৌবনা দেখিয়া, সহকারকে "উপভোগক্ষম" মনে করিয়া আনন্দলাভই বা করিবে কেন ? শকুন্তলারও ফুল ফুটিয়াছে, প্রাণে ভালবাসার সাধ জাগিয়াছে—তাই সে মুকুলিতা মাধবী লতার পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। তাহারই মনোগত নিগূঢ় ভাবটি প্রিয়ম্বদা রঙ্গরসের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলে।

শকুন্তলার ফুল ফুটিল। মধুলোভী ভ্রমরও আসিয়া দেখা দিল। মানব-ভ্রমর রাজা দুষ্মন্তও তপস্বি কন্যাগণের রক্ষাছলে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অবসর বুঝিয়া মদনদেবতা ফুলশর নিক্ষেপ করিলেন। সে ফুলশর তীক্ষ্ণ লৌহশলাকারূপে শকুন্তলার কোমল বক্ষ ভেদ করিল। "অজ্ঞাত-যৌবন-মদন-বিকারা" বালা বিচলিত হইয়া উঠিল। "ইঁহাকে দেখিয়া আমার তপোবন বিরোধী ভাব জাগিতেছে কেন?" বলিয়া শকুন্তলা বিস্মিত হইল। বিদ্যাশিক্ষার বলে কুমারী মনে মনে অবশ্যই বুঝিল—ইহা মদন-দেবতার খেলা।

শকুন্তলার অন্তর তখন অতিথির পরিচয় জানিবার জন্য ভিতরে ভিতরে উৎকণ্ঠিত। তাহার ইচ্ছাই তখন অনসূয়ার মুখ দিয়া যেন বাহিরে প্রকাশ পাইল। সানুরাগ লজ্জা আসিয়া কুমারীর মুখে, চক্ষুতে, সর্ব্বাঙ্গে একটি পুলক-শ্রী ফুটাইয়া তুলিল। কাহাকে দেখিবামাত্র কাহারও হৃদয়ে যে একটি রসময়ী বৃত্তি জাগিয়া উঠে—উহার নাম পূর্ব্বরাগ, চক্ষুরাগ, তার-মৈত্রিক, ও অহেতুক প্রেম বা মদনশরজ ভাব।

শকুন্তলার আকারে ভাবভঙ্গীতে ইহা প্রথম অস্পষ্ট প্রকাশ পাইল। তারপর দুষ্মন্তের মুখে "প্রভাতরল জ্যোতি পৃথিবীতলে কখন ফুটে না" শুনিবামাত্র তাহার কপোল দু'টী এমন রক্তিম হইয়া উঠিল, মুখখানি এরূপভাবে ভূমি-ন্যস্ত হইয়া গেল—তাহাতে ঐ অস্পষ্টতা স্পষ্ট হইয়াই দেখা দিল।

কিশোরীর হৃদয়ে প্রথম প্রেমসঞ্চার বড় মধুর। "আমি যাই" বলিয়া সেই অঙ্গুলি তর্জ্জন, সেই কৃত্রিম কোপ প্রকাশ, সেই অনিচ্ছাকৃত প্রস্থানোদ্যোগ বড়ই হৃদয়গ্রাহী। প্রেমপাত্রের সহিত কথা কহিতেছে না, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি উৎকর্ণ হইয়াই শুনিতেছে; তাঁহার দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে পারিতেছে না, অথচ অন্যদিকে অধিকক্ষণ চক্ষুকে

নিবিষ্ট রাখিতেও পারিতেছে না। কুশসূচিতে বিদ্ধ চরণ দু'খানি যেন চলে না; কুরুবকশাখায় সংলগ্ন অঞ্চলখানিও যেন অগ্রগমনে বাধা দিতেছে। অথচ সেই অবসরে বিলম্ব করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া লওয়াটিও চাই—কি সুন্দর দৃশ্য!

শকুন্তলা এইরূপে নবপ্রণয়-সুলভ অকৃত্রিম ছলাকলার মধ্য দিয়া আপনার ভালবাসাটি নিবেদন করিল। কুমারীদের "বুক ফাটে ত, মুখ ফোটে না" সত্য; আবার ভাবভঙ্গী ও বিলাসবিভ্রমের ভিতর দিয়া সহজে তাহারা ধরা পড়িয়াও যায়।

মালিনী-তীরবর্ত্তী লতামণ্ডপে শিলাপট্টের উপর কুসুমাস্তরণে শকুন্তলা শায়িতা। জলনলিনী যেন শীতল সলিল-শয্যা ছাড়িয়া প্রস্তরের উপর নিপতিতা। প্রচণ্ড তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া লাবণ্যময়ী ছায়া আজ ম্রিয়মাণা। বক্ষের উপর ঘন করিয়া উশীরের অনুলেপন। সখীরা ধীরে ধীরে কমলদল সঞ্চালনে ব্যজন-রত। কুসুম-কোমলা বালা আজ মদনের তীক্ষ্ণ শরে আহতা হরিণীর মত অবস্থায় উপনীতা। এমত জ্ঞানহারা—সখীরা যে বাতাস দিতেছে,—সে উদ্বোধ পর্য্যন্ত নাই। যে সকাম ভালবাসায় মানুষ মুগ্ধ, দগ্ধ ও উন্মত্ত হইয়া থাকে, শকুন্তলা আজ সেই ভালবাসা বাসিয়া এই দশায় নিপতিতা। সে লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি আজ পাণ্ডুরবর্ণা, সে যৌবনোৎফুল্ল মুখকান্তি বড় ম্লান, বড় দুঃখদর্শন। মদনের শক্তি কি অমোঘ! সেই নবদল-স্নিগ্ধা মাধবী লতা দুই দিনের মধ্যেই এমত বিশুষ্কা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু উপায়? কোন্ ঔষধে এ হরিণী সুস্থা হইবে কোন্ বারিসেকে এ মাধবীলতা বাঁচিবে? শকুন্তলা সখীদের কাছে নিজমুখে আপনার ভালবাসার কথা জানাইল; যাহাতে রাজার অনুকম্পার পাত্রী হয়, তজ্জন্য উপায় করিতে অনুরোধ করিল। নতুবা সে আর বাঁচিবে না। তখন

প্রিয়ম্বদা—শকুন্তলারই ভবিষ্যৎ মূর্ত্তি—দেবসেবাচ্ছলে পুষ্পরাশির মধ্যে মদনলেখন পাঠাইবার যুক্তি দিল। পাছে অবজ্ঞাতা হয় সেই ভয়েই শকুন্তলা কাতরা। স্নেহ সর্ব্বদাই অনিষ্টাশঙ্কী। প্রিয়ম্বদা তখন শকুন্তলারই আশার ছবিটি মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইল; বলিল

"আত্ম-গুণাবমানিনি, তাপভয়ে শারদীয়া জ্যোৎস্নাকে আতপত্র দিয়া কে নিবারণ করে?" শকুন্তলা ইহাই শুনিতে চাহে, তখন তার ম্লানমুখে ক্ষীণ অথচ উজ্জ্বল একটী হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যেই প্রেম-গীতিকা রচনা করিয়া শকুন্তলা প্রিয়ম্বদার হাতে দিল—

"নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় আমি জানি না; কিন্তু মদন—কি দিবা, কি রাত্রি—তব হস্তাভিলাষী আমার অঙ্গে নিদারুণ তাপ জন্মাইতেছে।"

পত্র প্রেরণ আর করিতে হইল না। অনুকূল-সৌভাগ্য সম দুষ্মন্ত আসিয়া সহসা প্রবেশ করিলেন। শকুন্তলার-প্রেম গীতিকার উত্তর দিবার ছলেই কহিলেন—

"হে কৃশাঙ্গি! মদন তোমার মত আমাকেও দগ্ধ করিতেছে। দিবা কুমুদিনীকে যতখানি ম্লান করে, শশাঙ্ককে তদপেক্ষা অধিক ম্লান করিয়া থাকে।"

রাজাকে দেখিয়া সখীরা স্বাগত সম্ভাষণ করিল। শকুন্তলাও উঠিবার প্রয়াস পাইল কিন্তু তাহার আর উঠা হইল না। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখা তৈলসেকে জ্বলিয়া উঠিল। উপযুক্ত ঔষধ পাইয়া সে বিকার উপশম প্রাপ্ত হইল। সে তাপদাহ কোথায় মিলাইয়া গেল, তাহার স্থলে অরবিন্দ-সুরভি তরঙ্গ-শীতল মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। শকুন্তলা জানিল—দুষ্মন্ত তাহাকে ভাল বাসিয়াছেন, তাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন—আনন্দে শকুন্তলার বক্ষ ভরিয়া গেল।

শকুন্তলার হৃদয়ের কথাটি অনসূয়া প্রকাশ করিয়া অনুরোধ জানাইল—

"আপনারই জন্ত আমার সখী মদনের দ্বারা এই অবস্থায় উপনীতা; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ইহার প্রাণ রক্ষা হয়, তাহাই করুন।" রাজা অনুগৃহীত হইলেন, এই ভাব তিনি প্রকাশও করিলেন। শকুন্তলা কিন্তু পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ" জাতীয় কুমারী, তাই সে অনসূয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"সখি, অন্তঃপুর-বিরহ-পর্য্যুৎসুক রাজর্ষিকে অনুরোধ করার প্রয়োজন নাই।"

শকুন্তলার ইচ্ছা—রাজা যাহা করিবেন, তাহা আপনা হইতে প্রণয় বশতই তাহা যেন করেন; এবং সেই কথাটীও শকুন্তলা প্রিয়তমের মুখেই শুনিতে চায়। শুনিলও তাই। সমুদ্রবসনা পৃথিবীর সহিত আপনার তুলনা শুনিয়া মেঘবাতস্পর্শে নিদাঘার্ত্তা ময়ূরীর মত প্রত্যাগত-জীবিতা ও কৃতার্থ হইল।

শকুন্তলাকে রাজার নিকট রাখিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা চলিয়া গেল। শকুন্তলা প্রথম প্রণয়ে ব্রতী—এ নূতন সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল—

"পৃথিবীনাথ যাহার কাছে রহিলেন—সে ত অসহায়া নহে আর একাকিনীও নহে" এই বলিয়া প্রিয়ম্বদা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

"কি, সখীরা গেল?" প্রণয়ব্যাপারে অনভ্যস্তা শকুন্তলার কেমন একটু ভয় জন্মিল। অনাঘ্রাত সদ্যো-বিকসিত কুসুমের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক।

দুষ্মন্তের ভালবাসার আগ্রমধুর বচনে শকুন্তলা মুগ্ধা হইল। রাজা দুষ্মন্ত তখন রাজন্য-কন্যাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শকুন্তলাকে ক্রমেই সাহসিনী করিয়া তুলিতেছিলেন।

এইরূপে উভয়ের প্রেমখেলা চলিতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার

বিনা উপস্থিতিতে, গান্ধর্ব্ব বিবাহের আয়োজন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দাম্পত্য মিলনের পরিপূর্ণতা সাধন করা কবি ভাল বুঝিলেন না, দেশের পক্ষে, সমাজের চক্ষুতে উহা অনিষ্টকর বলিয়াই বোধ করিলেন, তাই তিনি ঐ সময়ে শান্তি-উদক হস্তে গৌতমীকে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রেই বুদ্ধি খোলে। শকুন্তলা তখন রাজাকে শাখান্তরিত থাকিবার পরামর্শ দিল। তারপর গৌতমীর সহিত সে লতামণ্ডপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল,—তদ্ভিন্ন আর উপায়ও ছিল না। নূতন প্রণয়ের মিলনাবেশে বিভোরাবালা ভাবিল—

"হৃদয়, যেমন তুমি সুখোপনত মনোরথ-পূরণে কালহরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর।"

বুঝা গেল—শকুন্তলার নিজের উপর আর কোন প্রভুত্বই নাই। এক্ষণে সে দুষ্মন্তে সম্পূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণে উদ্যত ও উৎসুক হইয়াছে। তখন চলিয়া যাইবার সময় লতামণ্ডপকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়া গেল—

"লতাকুঞ্জ (নিকুঞ্জ), সন্তাপহর, তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আমি আবার তোমাকে অভিনন্দিত করিব।" লতাকুঞ্জকে উদ্দেশ করা—একটী ছল মাত্র। দুষ্মন্তকে মিলিত হইবার ইঙ্গিত করা, আর আমিও আবার মিলিত হইব—এই আশা দেওয়াই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

প্রণয়ই মানুষকে অনেকরূপে শিক্ষা দেয়, নূতন রকমে গড়িয়া তোলে। প্রণয়-প্রসাদে হাবভাব-বিহীনা সরলা নারীও কলাকুশলা ও চতুরা হইয়া থাকে। শকুন্তলাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মহর্ষি উপযুক্তা ভাবিয়া যাহার হস্তে আশ্রমের গুরুভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন—সেই শকুন্তলা আজ আপনার সুখ দুঃখ লইয়া ব্যস্ত। গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার যাহার মাথার উপর—এ আব্দার, এ দুর্ব্বলতা তাহার সাজে না। এত বড় কর্ত্তব্যের চ্যুতি যাহারই হউক না কেন—

তাহার তাহা দোষ। দোষ দোষই। বালক বালিকা না বুঝিয়া যদি অগ্নিতে হাত দেয়, অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে ছাড়ে না।

শকুন্তলা বালিকা, অসামান্য সুন্দরী, বিশেষত পতিচিন্তায় আত্মহারা; তাহার দোষ সকলকার নিকট মার্জ্জনীয়; তাহার উপর সহানুভূতি আসা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। এ মার্জ্জনা, এ সহানুভূতি—দয়াবৃত্তি-উদ্ভূত দুর্ব্বলতা মাত্র। দেবরাজ ইন্দ্রই হউন আর প্রণয়বিবশা বালিকাই হউক,—দোষ করিলে দণ্ড লইতেই হয়। দোষের বিচারক দণ্ডদানের কর্ত্তাকে দয়ালু এবং দুর্ব্বল হইলে চলে না। দেবরাজ বলিয়া ইন্দ্রের দোষ যিনি মার্জ্জনা করেন নাই, প্রণয়বিবশা বালিকা বলিয়া তিনি শকুন্তলার ত্রুটিও মার্জ্জনা করিলেন না। দুর্ব্বাসা ক্রোধের অবতার, কর্ত্তব্যচ্যুতির জন্য দণ্ড দিয়া গেলেন মাত্র।

অগ্নিগৃহ-প্রবিষ্ট মহর্ষি অশরীরিণী বাণী শুনিয়াই শকুন্তলার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। "ধূমনিরুদ্ধ-দৃষ্টি" যজমানের আহুতি আজ সৌভাগ্যবশত যজ্ঞীয় অগ্নিতেই নিপতিতা হইয়াছে। শকুন্তলা দুষ্মন্ত-দত্ত তেজ ধারণ করতঃ অগ্নিগর্ভ শমীর মতই পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তখন মহর্ষি শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করাই সমীচীন মনে করিয়া গৌতমীকে আদেশ দিলেন—"শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতকে সঙ্গে লও, শকুন্তলাকে পতিগৃহে রাখিয়া আইস।"

এত দূরপথে গৌতমীর মত প্রবীণা স্ত্রীলোককে অভিভাবিকারূপে সঙ্গে দিয়া ঋষিবর অতিশয় সাংসারিক দূরদৃষ্টতারই পরিচয় দিয়াছেন। শার্ঙ্গরব স্পষ্টবক্তা, তেজস্বী, অন্যায়াসহিষ্ণু এবং ঋষিসুলভ কোপন-স্বভাব; শারদ্বত প্রিয়ভাষী, বিনয়-মসৃণতেজঃসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, ও তপস্বিসুলভ শান্তচিত্ত।

শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইবে, তপস্বিনী রাজরাণীর আসনে বসিবে—

কি আনন্দের কথা! কিন্তু সেই আবাল্য পরিচিত আশ্রম, সেই সমদুঃখ-সুখ একপ্রাণা সখিগণ, সেই সন্তান-নির্ব্বিশেষে পালিত মৃগ, তরুলতা ও পশুপক্ষী ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ কি কম কষ্টের কথা! সখীরা শকুন্তলাকে কত আদর করিয়া সাজাইয়া দিয়া আসিতেছে. আজ সেই সখীদের হাতে তাহার শেষ সজ্জা;—মনে হইবামাত্র শকুন্তলার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। পতিসমাগম-ব্যাকুলা হইয়া শকুন্তলা যদি হাসিতে হাসিতে তপোবন ছাড়িয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা তাহাকে হৃদয়হীনা, ভোগপরায়ণা ও বিলাসিনী বলিয়া ভাবিতাম। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী ও সখাসখীদের ছাড়িয়া যাইতে যার কষ্ট না হয়—সে কেমন রমণী! শকুন্তলা এমন স্বার্থপর, আত্মভোগ-সর্ব্বস্বা রমণী নহে।

স্নানোত্তীর্ণ ঋষি উৎকণ্ঠিত হৃদয়, বাষ্পভারাবরুদ্ধ বচন, চিন্তাজড় নয়ন লইয়া শকুন্তলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লজ্জায় নতনয়না কন্যা পিতাকে কেবল প্রণাম মাত্র করিল। মুখ দিয়া তখন তাহার কোন কথাই বাহির হইল না।

মহর্ষি কণ্ব তখন আশ্রমের তরুদিগের নিকট শকুন্তলার বিদায় প্রার্থনা করিলেন—

"যাহাদিগকে জলসেচন-তৃপ্ত না করিয়া শকুন্তলা জল খাইত না, ভূষণ-প্রিয়া হইয়াও যাহাদিগের প্রতি স্নেহবশে পল্লব গ্রহণ করিত না, যাহাদের নব-কুসুমোদ্গম হইলে সে উৎসব বলিয়া মনে করিত—সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইতেছে; "সন্নিহিতদেবতা" তপোবন-তরু, তোমরা অনুজ্ঞা দাও।"

তপোবনের তরুরাও কোকিল-কলকণ্ঠের ধ্বনিতে সে অনুজ্ঞা প্রদান করিল। বাস্তবিক মনে হয়, যেন তপোবন তরুগুলি এক একটী রক্ত-মাংসে গড়া হৃদয়-সমন্বিত সচেতন জীব। অচেতনে চেতনের প্রতিষ্ঠা

করা, জড়কে মূর্তিমান্ করিয়া তোলাই প্রকৃত অলৌকিক কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। এ চিত্র হৃদয়ে শান্তি ও পবিত্রতা আনিয়া দেয়, অভিনব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এ যেন একাধারে নন্দন-কাননের সুষমা, ভাগীরথীর পুণ্য প্রপাত। এ যেন স্বপ্নের ফুল, আরাধনার ফল!

শকুন্তলা জনান্তিকে—আর কেহ শুনিতে না পায়—এমন ভাবে প্রিয়ম্বদাকে কহিল,—

"সখি, আমি আর্য্যপুত্রের দর্শনলাভের জন্য সমুৎসুক হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার চরণ যে তপোবন ছাড়িয়া যাইতে চাহে না!"

শকুন্তলা যেমন তপোবন-বিরহে কাতরা, শকুন্তলারও আসন্ন-বিরহে তপোবনের অবস্থা একই প্রকার। হরিণীরা তৃণকবল মুখে করিয়াই রাখিয়াছে, ময়ূরীরা নৃত্য ছাড়িয়া দিয়াছে, লতারা শুষ্ক পত্রগুলি ফেলিয়া যেন বাষ্প বর্ষণ করিতেছে। কাব্যের অলকারগুলি সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিল। হৃদয়ের ভাবনিচয় মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল।

শকুন্তলা তখন ভগিনীরূপা মাধবীলতার নিকটে গেল। তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—

"লতা বহিন, তোমার শাখাময় বাহু দিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর—আজ আমি অনেক দূরে চলিলাম।"

পিতার দিকে ফিরিয়া স্নেহময়ী কন্যা অনুরোধ করিল, "বাবা, ইহাকে আমারই মত ভাবিয়া ভালবাসিও।"

সখীদের নিকট গিয়া কহিল "এই মাধবীলতাকে তোমাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলাম।"

শকুন্তলার সহোদরা ছিল না; সে সাধ মাধবীকে দিয়াই মিটাইয়া লইয়াছে। ভগিনীকে ভগিনীদের হাতে দিয়াই সে এখন নিশ্চিন্ত হইল।

গর্ভভার-মন্থরা মৃগবধূ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। তখন শকুন্তলা পিতাকে অনুরোধ করিল, "বাবা, এই উটজচারিণী মৃগবধূর যখন প্রসব হইবে, তখন আমাকে সে সংবাদ দিতে ভুলিও না।" প্রসবকালে বিপৎ ঘটিবার সম্ভাবনা, ইহা যে বড়ই যন্ত্রণাপ্রদ—রমণীমাত্রেই তাহা জানে। তজ্জন্য রমণীরা ব্যাকুলও হইয়া থাকে। ইহা তাহাদের আশৈশব প্রকৃতি।

পশ্চাৎ হইতে কে যেন বসনাগ্র টানিতে লাগিল,—শকুন্তলা ফিরিয়া দেখে—যাহার কুশসূচি-বিদ্ধ মুখে কত আদর করিয়া সে ব্রণনাশক ইঙ্গুদী তৈল সেচন করিয়াছে, যে মাতৃহারা সন্তানটিকে হাতে করিয়া সে নীবার-মুষ্টি খাওয়াইয়া বড় করিয়া তুলিয়াছে—সেই মৃগশিশুটী ছল ছল নেত্রে সম্মুখে উপস্থিত! শকুন্তলার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। শকুন্তলা যে দুই দিন পরেই পুত্রের মাতা হইতেছে; কেমন করিয়া পুত্রকে মানুষ করিতে হইবে, সে শিক্ষা তাহার কৃত্রিম পুত্রকে দিয়া অগ্রেই হইয়া গেল।

তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা সেই চিরপরিচিতা সরসীর তীরে বটতরুর ছায়ায় গিয়া বসিল। সেখানেও দেখে—চক্রবাক্ তাহার প্রিয়ার সঙ্গে আলাপ করিতেছে না—মৃণালখণ্ড মুখে রাখিয়া সে এক দৃষ্টে তাহারই পানে তাকাইয়া আছে। চক্রবাক্ সারারাত্রি বিরহ ভোগ করিয়া থাকে; ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা সে (চক্রবাক্) ভালরূপই জানে। শকুন্তলার বিরহ সে মর্ম্মে মর্ম্মেই অনুভব করিতেছে।

এইবার তপোবনের সীমানা ছাড়াইয়া পথ ধরিতে হইবে। তখন শকুন্তলা পিতাকে শেষ আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "বাবা, তোমার কাছ ছাড়া হইয়া মলয়পর্ব্বত-চ্যুত চন্দনলতার মত কেমন করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিব?"

সখীদের কাছেও শেষ বিদায় লইয়া বলিয়া গেল, "সখি, তোমরা দু'জনে এক সঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন কর।"

আবার পিতার দিকে ফিরিয়া শেষ প্রার্থনা করিয়া বলিল, "বাবা, কবে আবার তপোবন দেখিতে পাইব?"

এ যাওয়া ত আর দুই দশদিন, দুই একমাস বা দুই এক বৎসরের জন্য নহে। পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার পর তবে পতির সহিত এই তপোবনে আসা ঘটিবে—সে কতকাল!

রাজসভায় তপস্বিগণের সহিত শকুন্তলা আসিয়া উপস্থিত হইল। অবগুণ্ঠনবতী "পরিস্ফুট-শরীরলাবণ্য।" পাণ্ডুপত্র-মধ্যে কিসলয়ের মত তাপসবালা সভাসদ সম্মুখে দাঁড়াইল। তপোবনে প্রবেশের সময়ে দুষ্মন্তের বরস্ত্রী-লাভসূচক দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইয়াছিল, আর রাজসভায় প্রবেশ করিয়া শকুন্তলার দক্ষিণ নয়ন কম্পিত হইল। আমাদের শাস্ত্রে বলে—যাঁহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল—তাঁহারা পূর্ব্বেই শুভাশুভ ঘটনার আভাস পাইয়া থাকেন।

প্রতিহারীর মুখে শকুন্তলার রমণীয় আকৃতির কথা শুনিয়া রাজা যখন পরস্ত্রীর মুখদর্শন অনুচিত বলিলেন, শকুন্তলার অন্তর তখনই এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। আর্য্যপুত্রের সেই গাঢ় ভালবাসা স্মরণ করিয়া সরলাবালা তখন স্পন্দিত বক্ষ বাহু দুটী দিয়া চাপিয়া রাখিয়া কোন মতে ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল।

শাপ-প্রভাবে বিগত-স্মৃতি রাজা যখন বিবাহ ব্যাপারটিকে "উপন্যস্ত মিথ্যা" বলিয়া প্রকাশ করিলেন, তখন অভাগিনীর আশঙ্কা সত্য হইয়া উঠিল। সযত্ন-পোষিতা আশালতাটী চিরদিনের মত ছিন্ন হইয়া গেল। স্থিরবুদ্ধি শারদ্বত শকুন্তলার উপরই প্রমাণের ভার অর্পণ করিল; অভাগিনী তপস্বিনী শকুন্তলা কি করিবে? সেই প্রাণঢালা ভাল-

বাসার যখন এই অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তখন স্মরণ করাইয়া দেওয়ার ফল কি? মনস্বিনী আত্মসম্মান-যুতা নারী যাহা ভাবিতে পারে, শকুন্তলা তাহাই ভাবিল; অথচ এ অবস্থায় আত্মশুদ্ধির জন্য, সতীর মর্য্যাদা বজায় রাখার জন্য, প্রমাণ দেওয়া ব্যতীত আর তাহার উপায়ান্তর ছিল না। অভাগিনী সীতাও একদিন আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল। শকুন্তলা ভূমিকামাত্র করিয়াছে, এমন সময়ে রাজা তাহাকে "কূলঙ্কষা" নদী বলিয়া গালি দিলেন। আঘাতের উপর আঘাত! সতী নারী সকল সহিতে পারে কেবল সতীত্বের উপর আঘাত সহ্য করিতে পারে না। সহিষ্ণুতাময়ী শকুন্তলা তথাপি ধৈর্য্য ধারিয়া প্রমাণ দিতে বসিল।

"একি—অঙ্গুলীতে প্রণয়চিহ্নরূপে প্রদত্ত অঙ্গুরীয় যে নাই! অভাগিনী বসিয়া পড়িল।

তখন সেই রাজসভা মধ্যে রাজার কি হৃদয়হীন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ!"

শকুন্তলা তখন 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রমের সরলা মৃগী তখন যেন সিংহীর আকার ধারণ করিয়াছে।

সেই তীক্ষ্ণ উপহাস, সেই মর্ম্মান্তিক অবজ্ঞার ভিতর দিয়াই অভাগিনী সম্রাটের চিত্তে পূর্ব্বস্মৃতি উদ্দীপ্ত করিবার কতই চেষ্টা করিল; সর্ব্ব উপায়ই তখন ব্যর্থ। সেই আত্মনিবেদিতা তপস্বিনী আজ সর্ব্ব সমক্ষে মিথ্যাবাদিনী, ছলনাময়ী ও অসতীরূপে প্রমাণিতা হইল। সতীর পুত্র বেশ্যার পুত্ররূপে ঘৃণিত হইবে—উঃ, এ লজ্জা অসহ্য! সহিষ্ণুতাময়ী ধরা আজ ভূমিকম্পে বিদীর্ণপ্রায়। শকুন্তলার বাক্য স্খলিত, দৃষ্টি বাষ্প-কলুষ, বিম্বাধর আরক্ত, ভ্রূদ্বয় কুটিলকুঞ্চিত; সর্ব্বাঙ্গ থর থর কম্পবান্।

রাজা শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন না। ঋষিকুমারদ্বয় তথায় শকুন্তলাকে

রাখিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিতে উদ্যত—আর অনন্যাশ্রয়া—শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাতে ছুটিতেছে। "ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক আমি প্রতারিতা হইয়াছি, তোমরাও আমাকে ত্যাগ করিলে?" এইরূপে করুণস্বরে তাহাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া গৌতমীর রমণী-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। গুরুসম তেজস্বী শিষ্য শার্ঙ্গরব শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া যখন বলিল, "আঃ অপরাধিণি, এক্ষণে আবার স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেছ?"

সেই তপস্বিনী তখন ভীতা ও কম্পিতা। তাহার কর্ণকুহর ভেদ করিয়া শার্ঙ্গরবের সেই পরুষবাক্য তখন সভাক্ষেত্র ভীত চকিত করিয়া দিল।—

"শোন তুমি শকুন্তলে, রাজা যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তুমি ত কুলভ্রষ্টা;—তোমাকে লইয়া পিতা কি করিবেন! আর তুমি যদি আপনার কার্য্য পবিত্র বলিয়া মনে কর, তবে তোমার পক্ষে পতিকুলে দাসত্ব করাও ভাল।"

তপস্বীরা চলিয়া গেলেন। শকুন্তলা "রাজ-পুরোহিতের গৃহে প্রসবকাল পর্য্যন্ত থাকিবেন"—ইহাই স্থির রহিল। শকুন্তলা পুরোহিতের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবার সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। কোথা হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়াই ক্রন্দনপরা শকুন্তলাকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে শকুন্তলার অভাবনীয় অন্তর্দ্ধান ঘটিল।

কিম্পুরুষ বর্ষে—হেমকূট পর্ব্বতে—মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমে পুত্রসমেতা শকুন্তলা অবস্থিতা। যাহার মনে সুখ নাই, স্বর্গে বা তপোবনে কোথাও তাহার সুখ নহে। শান্তিময় আশ্রমে থাকিয়াও শকুন্তলা বিরহে দীনা, নিয়মে ক্ষীণা, একবেণী-ধারিণী। পরিধানে একখানি মলিন বস্ত্র সেই বরবপুকে

বেষ্টন করিয়া আছে মাত্র। শকুন্তলা আজ প্রোষিতভর্ত্তৃকা; বেশভূষা নাই, শরীর সংস্কার নাই; মুখখানি কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ; রক্তিম অধর আভাহীন, পাটল-বর্ণ। দৃষ্টি কখনও ভূমিপানে আনত, কখনও বা শূন্য পথে বিক্ষিপ্ত। অন্তরে বাহিরে শকুন্তলা প্রকৃত তপস্বিনী।

দেবকার্য্য সাধনান্তে—প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দুষ্মন্ত সেই বিরহকৃশা, দীর্ঘব্রতধারিণী শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র চিনিয়া ফেলিলেন। শকুন্তলা কিন্তু অনুতাপ-বিবর্ণ রাজাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারে নাই। শকুন্তলা বিরহে যতই পরিম্লানা বা দুঃখিতা হউক — তথাপি তাহার যাতনা অপেক্ষা দুষ্মন্তের যাতনা অধিক। সেই আত্মনিবেদিতা সরলা তপস্বিনীকে সভামধ্যে ব্যাভিচারিণীরূপে দূর করিয়া দেওয়ার যে কি যাতনা—তাহা দুষ্মন্তই জানেন। এ যে স্বহস্তে হৃৎপিণ্ডচ্ছেদের অপেক্ষাও ভয়ানক। এ অবমাননা, এ নৃশংসতার যে সান্ত্বনা নাই। দুষ্মন্ত এখন দহ্যমান বনস্পতির মত ভিতরে বাহিরে পরিবর্ত্তিত। সে রাজকান্তি অনুতাপে ও মর্ম্মবেদনায় এমত বিবর্ণ, তাঁহার জীবলোক-পরিবর্ত্তন এমনই অসম্ভব রকমের—শকুন্তলা রাজাকে দেখিবামাত্র চিনিতেই পারিল না। পুত্র মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, ইনি আমাকে পুত্রের মত আলিঙ্গন করিতেছেন কেন?"

এত দিনের পর দৈব কি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন; আর্য্যপুত্রের কি অভাগিনী শকুন্তলার স্মৃতি এখন জাগিয়া উঠিয়াছে? সতীনারী এই শুভাদৃষ্টকে বরণ করিয়া লইবার জন্যই আজ নিয়মবতী ও ব্রতধারিণী।

তখন শকুন্তলা সহর্ষে বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে "জয়তি জয়তি আর্য্যপুত্র" বলিয়া প্রিয়তমকে অভিনন্দিত করিল। নিরভিমানিতাই আদর্শ প্রেমের লক্ষণ। এত বড় অপমান, এত বড় লজ্জা ও এত বড় লাঞ্ছনার পর গদগদ কণ্ঠে জয় ঘোষণা করা আদর্শ নিরভিমানিতারই সূচক। আশ্রমে থাকিয়া

শকুন্তলা স্থিরা, ধীরা ও নিয়ম-সংযতা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর সে এখন পুত্রের জননী। পুত্রের উপস্থিতিতে সখীদ্বয়ের সমক্ষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বিনী।

"মা, ইনি কে?" সন্তান মাতাকে আবার প্রশ্ন করিল। জননী উত্তর করিল, "ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর?—যে ভাগ্য আজ আমাকে এই অবস্থায় উপনীতা করিয়াছে, আজ আবার যে ভাগ্য আর্য্যপুত্রকে অচিন্তনীয়-রূপে এই অপূর্ব্বস্থানে আনিয়া দিয়াছে, সেই ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।

শকুন্তলার বড় ইচ্ছা, জানিয়া লয়—কেমন করিয়া সে আর্য্যপুত্রের স্মরণে আসিল। রাজা তখন শকুন্তলার চক্ষু কোণ-লগ্ন অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শকুন্তলাকে অভিজ্ঞান-স্বরূপ সেই অঙ্গুরীয়টী প্রত্যর্পন করিয়া কহিলেন—

"ঋতু সমাগমের চিহ্নস্বরূপ কুসুমটীকে লতা আবার ধারন করুক।" কুসুমটী এখানে অঙ্গুরীয়, লতা শকুন্তলা। শকুন্তলা সে অঙ্গুরীয় লইল না! যে অঙ্গুরীয় তাহাকে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহাকে আর বিশ্বাস নাই। প্রিয়তমের স্মৃতিচিহ্ন প্রিয়তমের নিকটেই থাক্। বাহ্য-স্মৃতিচিহ্নে আর তাহার আবশ্যক নাই।

পতির সহিত মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমে যাইতেও আজ শকুন্তলার লজ্জা। সে এখন পতিপার্শ্বে নববধূর মতই আপনাকে মনে করিতেছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানবপ্রকৃতির পারবর্ত্তন। মহর্ষি কাশ্যপ তখন (শকুন্তলার কর্ত্তব্য-চ্যুতির ফল-স্বরূপে) দুর্ব্বাসার শাপের কথা দুষ্মন্তকে জানাইলেন।

শকুন্তলার চিত্তে আর কোন ব্যথাই রহিল না। তাহার মনে হইল, ভাগ্যবশত আর্য্যপুত্রকে অকারণ ধর্ম্মপত্নী-পরিত্যাগী হইতে হইল না,

এত বড় নিন্দা হইতে আর্য্যপুত্র যে নির্ম্মুক্ত হইলেন,—ইহাতেই সতীর আনন্দ। এত যে দুঃখ গেল, তাহার জন্ত আর্য্যপুত্র অনুযোগার্হ নহেন, ইহাতেই পতিব্রতার তৃপ্তি। পতিকে কেহ লজ্জা দিবে না, প্রেমহীন ও নির্দ্দয় ভাবিবে না—ইহা পতিপ্রাণার বড় রকমের সান্ত্বনা। ঋষি দুর্ব্বাসা কখন যে শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শকুন্তলা মনে করিতে পারিল না।

শকুন্তলার পুত্রটী মারীচের আশ্রমে প্রসূত। সেই স্থানে মহর্ষি কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়সংস্কার-প্রাপ্ত। এই পুত্রটীর নামকরণ হইয়াছে ভরত। তারপর দুষ্মন্ত মহর্ষি মারীচ ও দাক্ষায়ণী অদিতির আশীর্ব্বাদটীকে রক্ষা-কবচের মত গ্রহণ করিয়া, দেবরাজের আকাশবিহারী রথে আরূঢ় হইয়া স্ত্রী-পুত্র সহ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাগণ শকুন্তলাকে শ্রদ্ধার মত, পুত্রটীকে বিত্তের মত, রাজা দুষ্মন্তকে বিধির মত অভিনন্দিত করিয়া লইল।

পতিবিরহিণী সীতা বাল্মীকি আশ্রমে, প্রোষিতভর্ত্তৃকা শকুন্তলা মারীচ আশ্রমে। দুই জনেই বিরহে দীনা, ক্ষীণা ও পরিম্লানা—আতপ-তাপ-তপ্তা বল্লীর মত শোচনীয় অবস্থায় উপনীতা। প্রিয়সমাগমে আবার উভয়েই বায়ুকম্পিতা লতাটীর মত আন্দোলিতা।

কালিদাসের বিরহিণী শকুন্তলার চিত্র, আর ভবভূতির বিরহিণী সীতার চিত্র সকল বিষয়ে ঠিক একরূপ নহে। বাল্মীকির সীতার তুলনায় ভবভূতির সীতা ভিন্নরূপ। ভবভূতি নিজের চিত্রিতা সীতাটিকে বাল্মীকির সীতা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর করিতে পারিয়াছেন বলা যায় না। কিন্তু কালিদাস যে পুরাণ-চিত্রিতা শকুন্তলা অপেক্ষা আপনার শকুন্তলার চিত্রটি অধিকতর সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী

(চরিত্র সমালোচনা)

মহাশ্বেতা সত্ত্বগুণের শুভ্রমূর্ত্তি, কাদম্বরী রজোগুণের গৌরাকৃতি। একটি তপোবনের অধিদেবতা, অপরটি সাম্রাজ্যের রাজলক্ষ্মী। প্রথমটী স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী যেন আকাশ পথ বহিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা। অন্যটি গিরিতটিনী যেন পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া সমতল ভূমিতে বহমানা। মহাশ্বেতা ঋষি-কুমার পুণ্ডরীকের অনুরাগিণী, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী। কাদম্বরী রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়ে দত্তহৃদয়া, রাজার রাজরাণী। এটি শান্তির বিমল শ্বেতিমা। ওটি ভোগের উজ্জল রক্তিমা। একজন আদর্শ দেবী প্রতিমা। অন্যজন-গরীয়সী মানবী ছবি।

মহাশ্বেতা

মহাশ্বেতা একাধারে ভালবাসার, সংযমের ও ত্যাগের সজীব চিত্র। দর্শনমাত্রই যে সে আপনার প্রাণ মন, ঋষিকুমার পুণ্ডরীকের পদে পুষ্পাঞ্জলিরূপে দান করিল, এ ভালবাসার ছবি।

মধুকরীর মত আকৃষ্টা হইয়াও যে, সে কত কষ্টে আপনার দুর্দ্দমনীয় চিত্তটিকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল, এ সংযমের মূর্ত্তি। সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া একাকিনী নির্জ্জনারণ্যে সে যে পতি-দেবতার জন্য কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিল—এ ত্যাগের চিত্র। রাজকন্যা হইয়া সে যে ভাবে পিতামাতা আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীর মত সতীব্রত পালন করিতেছিল, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যাবন্দনা, শিবারাধনা করতঃ সে যে প্রকারে বনজাত ফলমূলে কোন মতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া অতি দীর্ঘ দিনগুলি

কাটাইয়া দিতেছিল—তাহা সাধারণ মানবীতে দুর্লভ, একমাত্র মহাশ্বেতাতেই সুলভ।

চন্দ্রাপীড়ের নিকট জীবন ইতিহাস বিবৃত করায় এবং রাজপুত্রের যথাযোগ্য আতিথ্যসৎকার করায় মহাশ্বেতার সংযম, আতিথেয়তা ও মহানুভবতার ভাবই পরিস্ফুট। বিবাহের অনুরোধ করিয়া মদলেখাকে কাদম্বরীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়ায়, দেবারাধনা ত্যাগ করতঃ চন্দ্রাপীড়কে লইয়া কাদম্বরী ভবনে যাত্রা করায় তাহার স্বার্থত্যাগ, সখিপ্রেম এবং সাংসারিক সূক্ষ্মজ্ঞানই সুপরিস্ফুট।

কি প্রেমে, কি বিরহে, ত্যাগের ভাব যাহার ফুটে, তাহারই প্রেম আদর্শ, সেই মর্ত্ত্যের দেবতা। যাহার না ফুটে, তাহার প্রেম স্বার্থ-পরতাপূর্ণ, সকাম, সে "রক্তমাংসময়-হৃদয়সমন্বিত" মর্ত্ত্যের মানব মাত্র। মহাশ্বেতা কপিঞ্জলের অনুরোধে ঋষিকুমারের জীবনরক্ষার জন্যই তাহাকে দেখিতে যায়, আত্মতৃপ্তির জন্য, ভালবাসার খেলা খেলিবার জন্য বা প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য মহাশ্বেতা যায় নাই। নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিবে, সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মচারিণী সাজিবে, তথাপি সে কুলকন্যার অনুচিত অভিসারিকার বেশে পুণ্ডরীককে দেখিতে যাইবে না। তুচ্ছ নিন্দার ভয়ে, সেই মহাপ্রাণের জীবনরক্ষায় উদাসীন থাকা উচিত নহে,—এইরূপ ভাবিয়াই মহাশ্বেতা মৃতপ্রায় পুণ্ডরীকের দর্শনে যাত্রা করে। আত্মোৎসর্গমূলক প্রেমই আদর্শ প্রেম। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসাই মর্ত্ত্যের অমৃত। মরিলে সকলই ফুরায়; মহাশ্বেতার মরণে ভয় নাই। তথাপি ধৈর্য্যশালিনী নারী দৈববাণীর উপর নির্ভর করিয়া পুণ্ডরীকের জীবন প্রত্যাশায় 'হৃদয়-কুসুমশোষী' দীর্ঘ শোকের মধ্যে কোনমতে জীবনটি ধরিয়া রাখিল; এ এক প্রকার আত্ম-বলি। এ বিরহও সংসারের শান্তি। মহাশ্বেতা সরস্বতীদেবীরই যেন

প্রতিচ্ছবি। বীণাবাদিনী, রাজকন্যা হইয়াও বিষয়ানুরাগিণী। সংস্কৃত-সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। কবি বাণভট্টের ইহা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। প্রেমবিহ্বলতার ও বিচারশক্তির এমন বিচিত্র সমাবেশ মুগ্ধনায়িকায় কদাচ দৃষ্ট হয়। এ চরিত্র যেমন শিরীষকুসুমবৎ সুকুমার, তদ্রূপ প্রস্তরবৎ কঠিন। এ যেন ভোগের মধ্যে ত্যাগ, কামনায় মধ্যে নিবৃত্তি, সংসারের মধ্যে গোলক। সত্ত্বময়ী, শ্বেতবর্ণা মহাশ্বেতাকে ব্রাহ্মণকুমার পুণ্ডরীকের অনুরাগিণী করায় কবির সূক্ষ্ম কলা কৌশলই প্রকাশিত হইয়াছে। "কাদম্বরী" কাব্যে মহাশ্বেতা উপনায়িকা হইলেও তাহার স্থান কাদম্বরী অপেক্ষা উচ্চে।

কাদম্বরী।

কাদম্বরী প্রেমের ও ভোগের জীবন্ত মূর্ত্তি। যুবতীর রূপোন্মাদ, গুণানুরাগিতা ও বীরপ্রিয়তার সঙ্গে প্রেমবিহ্বলতা ষোল আনাই তাহাতে বিদ্যমান্। মহাশ্বেতার বৈধব্যপ্রায় অবস্থা দেখিয়া সখি-প্রেমবশতই সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল 'বিবাহ করিবে না'। কিন্তু প্রতিজ্ঞা সে রাখিতে পারিল না। চন্দ্রাপীড়ের দর্শন-মাত্র তাহার চিত্তে পূর্ব্বরাগের সূচনা হইল। চন্দ্রাপীড়ের রমণী-মনোমোহন রূপ, অলোকসামান্য গুণ, অদৃষ্টপূর্ব্ব মহানুভবতা, শিক্ষামার্জ্জিত বাক্-কৌশল সেই পূর্ব্বরাগটীকে গাঢ় অনুরাগে পরিণত করিল। ইহা নায়ক চন্দ্রাপীড়েরই চরিত্রোৎকর্ষতার নিদর্শন।

কাদম্বরী রজোগুণের মূর্ত্তি। তাই সে লোহিত-বর্ণা। নবোদিত বালসূর্য্যের মত তাহার বর্ণ। এ সৌন্দর্য্য "দীপমালায় সমুজ্জ্বল নাট্যশালার মত যুবজন-প্রিয়"।

কাদম্বরী সুরার নাম। সুরার মতই ইহার চল চল লাবণ্য, সুরার মতই ইহার তীব্র মাদকতা। ইহার বাক্যে, ইহার অঙ্গভঙ্গীতে, ইহার

পদক্ষেপে যেন সুরার স্রোতই বহিতে থাকে। রজোগুণের অধিদেবতা বলিয়াই কাদম্বরী রাজপুত্রের অনুরাগিণী। চতুরা রাজলক্ষ্মী রাজারই ভোগ্যা হইয়া থাকে। মানুষীতে "প্রভাতরলজ্যোতির" সম্ভাবনা নাই বলিয়াই কাদম্বরী গন্ধর্ব্বাপ্সরার সহযোগে উদ্ভূতা। পিতা 'চিত্ররথ' গন্ধর্ব্ব, মাতা 'মদিরা' অপ্সরা। কাদম্বরীর বাগ্‌ভঙ্গী, কলাকৌশল, প্রণয়চাতুর্য্য ও যৌবনলীলা প্রভৃতি ভারতললনার উপযোগী হইবে না—তাই সূক্ষ্মদর্শী কবি ইহার দেহে গন্ধর্ব্বাপ্সর রক্ত বহাইয়াছেন। এ যেন স্বাধীনতা-প্রাপ্তা যৌবনবিলাসিনী পাশ্চাত্য দেশের নায়িকা।

প্রবৃত্তির সেবা করিয়া, ভোগের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া নিবৃত্তি-মার্গের পথিক হওয়া যায় না। হাব, ভাব, বিলাস, বিভ্রমে অঙ্গ ভাসাইয়া সুচতুর সখীদের সঙ্গে আবীর কুঙ্কুমের প্রেমলীলা করিয়া ত্যাগব্রত গ্রহণ করা চলে না। কাদম্বরীর হইল তাই। সেই সৌন্দর্য্যময় পুষ্পশরময় অন্তঃপুরে যে বাস করে, "মৃণালিকে", "কদলিকে", "কুমুদিকে," "চূত—কলিকে" দিনরাত্রি এই রহস্যালাপে যে ডুবিয়া থাকে, অলক্তক-রসও চরণের ভার, বিনা হস্তাবলম্বনে উত্থানও সাহসের কাজ,—এমন বিলাসের ভাবে যে অনুপ্রাণিত রহে—তাহার আবার প্রতিজ্ঞা, তাহার আবার ত্যাগ! এই প্রকার লালসারাগে আপাদ-মস্তক অনুরঞ্জিতা বলিয়াই কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে দর্শনমাত্র ভালবাসায় মুগ্ধ হয়। নহিলে কি তাহার চক্ষু চন্দ্রাপীড়ের দর্শনমাত্র—একেবারেই "নিশ্চল নিবদ্ধ-লক্ষ্য" হইয়া পড়ে? সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চ, কম্পন, স্বেদধারা ও নিশ্বাস-বৃদ্ধি কখন কি দেখা যায়? আশ্চর্য্য, কাদম্বরীর এই সহসা ভাবানুবন্ধ! চন্দ্রাপীড়কে দর্শনমাত্র মুখের সেই স্মিতহাস্য, নয়নের সেই মুগ্ধ-কটাক্ষ, সারা অঙ্গের সেই লজ্জার লীলা, একটী ভ্রূর সেই উল্লসিত মৃদু ভঙ্গিমা—এ সকল যেন কেবল কাদম্বরীরই বিশেষত্ব। এ যেন উদ্দাম প্রেমের গৈরিক নিস্রাব,

উন্মাদক যৌবনের বিপুল উচ্ছ্বাস, সম্ভোগাত্মক আদি-রসের চরম বিকাশ।

দুষ্মন্তের প্রথম দর্শনে শকুন্তলার মনে হয়—"ইহাঁকে দেখিয়া আমার মনে তপোবন-বিরোধী ভাবের উদয় হইতেছে কেন?" আর চন্দ্রাপীড়ের প্রথম দর্শনেই কাদম্বরীর রোমোদ্গম, উরুকম্প, স্বেদনির্গম ও উষ্ণায়ত নিশ্বাস দেখা গেল। শকুন্তলার হৃদয়ে অনুরাগের বীজটি প্রথমে ফুটিয়া উঠিয়া ক্রমে অঙ্কুরিত, পরিশেষে ফুল ফলে শোভা পায়, আর কাদম্বরীর চিত্তে প্রণয়কুসুম একেবারে বিকশিত হইয়াই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলার প্রণয়-নদী পর্ব্বতবক্ষে জন্ম লইয়া ক্রমে বিপুলকায়া প্রখরস্রোতা হইয়া দেখা দেয়; আর কাদম্বরীর প্রেমনদী একেবারেই বিশালোরস্কা খরতরঙ্গা হইয়া পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া ছুটিয়াছে। নির্ব্বিলাস তপোবনের মধ্যে, শমান্বিত ঋষিগণের মধ্যে বাস করিয়া শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ যেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে, বিলাসময় কুমারী পুরে—হাবভাবময়ী সখীদের সংসর্গে থাকিয়া কাদম্বরীর পূর্ব্বরাগও যে সেইভাবে ফুটিবে, এমত কথা নাই। তুলনায় বলা যায়, মহাশ্বেতার পূর্ব্বরাগ শান্ত উর্ম্মির নর্ত্তন, শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ খরতরঙ্গের উচ্ছ্বাস, আর কাদম্বরীর পূর্ব্বরাগ উদ্দাম কল্লোলের গর্জ্জন।

মহাশ্বেতা।

মহাশ্বেতার শৈশবজীবনের চিত্রটি বড় মধুর। গন্ধর্ব্বগণের অঙ্কে অঙ্কে বীণার মত আরূঢ়া থাকিয়া, পিতামাতার আদরে স্নেহে তাহার বাল্যকাল বড়ই সুখে কাটিয়াছিল। তারপর নবযৌবনের আবির্ভাব, সেও বড় মধুর। চরণের লীলাঞ্চিত গতি, চক্ষুর শান্ত কটাক্ষ, কপোলের আরক্ত আভা তাহাকে বড়ই প্রিয়দর্শনা করিয়াছিল; নবযৌবনের সমাগমে

নবপল্লব-বেষ্টিত কুসুমটির মত তাহার একটি নূতন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এমনই এক বসন্তকালের মধুমাসে মধুসখা কামদেবের মতই মধুর-দর্শন পুণ্ডরীক কপিঞ্জল সহ তাহার সম্মুখে আসিল। স্বর্গের পারিজাত মঞ্জরীর গন্ধ, ঋষিকুমারের পবিত্র সুন্দর শ্রী, অনির্ব্বচনীয় তপোজ্যোতি তাহার উপর একটি প্রভাবের বিস্তার করিল। সেই ঋষিকুমার মহাশ্বেতাকে দেখিবামাত্র মোহিত হইয়া তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ভালবাসার নিদর্শনরূপে সেই ঋষিকুমার মহাশ্বেতার কর্ণে স্বর্গের পারিজাত মঞ্জরী বাঁধিয়া দিল। উভয়েই উভয়ের দর্শনে মোহিত ও অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

মহাশ্বেতা আপনার প্রাণ মন ঋষিকুমারের পদে পুষ্পাঞ্জলিরূপে দান করিয়া মাতার সঙ্গে কোনমতে গৃহে ফিরিল। চরণ আর চলে না, দেহভার আর বহে না, পায়ের নূপুরগুলি পর্য্যন্ত মঞ্জীর-শব্দে মহাশ্বেতার প্রত্যাগমনে বারণ করিতেছিল। নবপ্রেম-রাগে আপাদ-মস্তক অনুরঞ্জিতা কুমারী তখন অলস দেহযষ্টি শয্যার উৎসঙ্গে ঢালিয়া দিল। তরলিকার মুখে ব্রাহ্মণকুমারের আকুলতার নিবেদনটি মহাশ্বেতা আদর করিয়াই শুনিল। তারপর পুণ্ডরীকের সখা কপিঞ্জল আসিয়া প্রিয়তমের ছবিটি মহাশ্বেতার চক্ষুর উপর ধরিল। তাহারই জন্ত ঋষি-কুমার মৃত্যুশয্যায় শয়ান, জীবনরক্ষার মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র তাহারই আয়ত্তে। মহাশ্বেতার উভয়সঙ্কট, তরলিকাকে সে কহিল, "সখি কি করিব? পিতামাতা আত্মীয় বন্ধুদের না জানাইয়া, ইতর রমণীর মত প্রণয়ীর নিকট ছুটিয়া যাইব? কুলমর্য্যাদা সদাচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নির্লজ্জার মত অভিসার করিব? আবার এদিকে ব্রহ্মহত্যা ঋষিহত্যার পাতকিনীই বা কিরূপে হইব?"

তরলিকার অনুরোধ, "যাওয়াই উচিত।" তখন সেই কুলকুমারী তরলিকাকে সঙ্গে লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল। দেখিল—পুণ্ডরীকের "নিশ্চলতারক"—চক্ষু দুইটি চন্দ্রলক্ষ্যে স্থির। বাহু দুইটি নিস্পন্দহৃদয়ের উপর অসাড়ভাবে নিপতিত। অভাগিনী বুঝিল—তাহার বড় আশার ইন্দ্রধনু কালমেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বসন্তের বাতাসে জীব-কুসুমটি ফুটিতে না ফুটিতে গ্রীষ্মের খরতাপে ঝলসিয়া গিয়াছে।

দৈববাণী হইল, "পুণ্ডরীক আবার বাঁচিবে।" যে মহাপ্রাণ অভাগীর জন্য অতৃপ্ত মনপ্রাণ লইয়া মহাযাত্রা করিয়াছে—তাহারই জন্য মহাশ্বেতার বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। দেব-নিবেদিত সে তনুটিকে যে রকম করিয়াই হউক, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। নিজের সুখের অপেক্ষা প্রেমাস্পদের সুখই যেস্থানে অধিকতর কাঙ্ক্ষিত, প্রকৃত প্রেম সেইস্থানেই।

তারপর মহাশ্বেতার যোগিনীবেশ। আর্দ্র বল্কলে যৌবনের মাধুরী ঢাকিয়া, সোনার অঙ্গে বিভূতি মাখিয়া, রাজকুমারী একাকিনী অরণ্যে শিবারাধনায় নিযুক্তা। মহাশ্বেতা যখন গভীর রজনীতে বীণা বাজাইয়া করুণ সঙ্গীত গাহিত, বনদেবীরা পর্য্যন্ত পাণ্ডুপত্র মোচন করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিত; লোকে ভাবিত, ভগবতী পশুপতির প্রসন্নতা লাভের আশায় তপস্যার্থ আবির্ভূতা।

হৃদয়বলে মহাশ্বেতা অদ্বিতীয়া। কতদিন কত বৎসর একই ভাবে কাটিয়া গেল। পুণ্ডরীক পরজন্মে বৈশম্পায়ন হইয়া মহাশ্বেতাকে দেখিয়া উন্মত্তের মত একদিন আশ্রমে উপস্থিত। আমাদের দর্শনশাস্ত্র মতে "উদ্বোধের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্মান্তরের স্মৃতি ফুটিয়া থাকে।" সেই জন্মান্তরের অতৃপ্ত ভোগ-লালসা আজ শত-বাহু হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিল। উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য পাইয়াও সে লালসার অগ্নি নির্ব্বাণ

প্রাপ্ত হইল না। সেই উন্মত্ত কামুক একদিন গভীর রজনীতে সুপ্তা মহাশ্বেতার অঙ্গস্পর্শ করিবার জন্ম অগ্রসর হইল—তপঃকৃশা নিয়মবতী সাধ্বীর সতীত্বের তেজে তার পাপদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। সতী-শাপে বৈশম্পায়ন ভস্মীভূত হইয়া পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইল। সেই দুষ্কৃতিও কিছুকাল যন্ত্রণা ভোগের পর শেষ হইয়া আসিল।

ভোগেই কর্ম্মের ক্ষয়। পুণ্ডরীকও সশরীরে মহাশ্বেতার নিকট উপস্থিত। এমত কঠোর সাধনা কখন বৈফল্যকে বরণ করে না।

যে কপিঞ্জল পুণ্ডরীকের আসক্তিকে পাপ মনে করিয়া মহাশ্বেতাকে পাপিষ্ঠা মায়াবিনী বলিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই কপিঞ্জলই আজ মহাশ্বেতাকে আদর্শ সাধ্বী দেবী বলিয়া পূজা করিল। যে প্রেম লৌহশৃঙ্খলের মত কষ্টকর বন্ধন মনে হইয়াছিল, তাহাই আবার জীবনের বন্ধনী হইয়া উঠিল।

(২)

কাদম্বরী।

কাদম্বরী ভোগময়ী প্রকৃতির মূর্ত্তি, সংসারের নানাবর্ণময়ী চিত্রশালা। কাদম্বরী যেন শৈশবের কলিকারূপে না ফুটিয়া একেবারেই প্রস্ফুটিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, জীবনাকাশে যৌবনের পূর্ণচন্দ্র যেন মধ্যস্থলে একেবারে উদিত হইয়াছে। কাদম্বরীকে যখন আমরা প্রথম দেখিতে পাই, তখন সে গন্ধর্ব্বনগরীর কুমারীপুরে—বিলাসিনী সখীদের মধ্যে বিলাস-শয্যায় শয়ানা। তাহার বাসবাটিকা যেন স্বর্গের অমরাবতী। সেখানে বিদ্যুতের স্থিরপ্রভা দিবারাত্রই জ্বলে, ফুটন্ত জ্যোৎস্নার রশ্মি নিরন্তরই ফুটে, মলয়ের মৃদুমন্দ বাতাস সর্ব্বক্ষণই বহে। সেস্থানে রূপসীরা রূপের ডালি লইয়া সজীব বিদ্যুল্লতার মত বেড়াইয়া বেড়ায়, গন্ধর্ব্বাপ্সরা

ললনাকুল বীণা বাজাইয়া সঙ্গীত গাহিয়া ভোগস্বর্গ সৃষ্টি করে। অন্তঃপুরে কোথাও আবীর কুঙ্কুমের বৃষ্টি, কোথাও সরসীজলে জলক্রীড়া, কোথাও সস্মিত পল্লব নিক্ষেপ, কোথাও যৌবন সম্বন্ধীয় বিশ্রম্ভরসালাপ। একদিকে শুক সারিকার প্রণয়কলহ, অপরদিকে মদলেখা ও তমালিকার চাটূক্তি; এইরূপে কাদম্বরী সংসার-নদীতে অঙ্গ ভাসাইয়া বহিয়া চলিয়াছে। কাদম্বরী যুবক রাজকুমারগণের আরাধ্যা সামগ্রী। এমন বিলাসময়ীকে বিলাসসঙ্গিনী করিতে কোন্ বিলাসী না ইচ্ছুক হয়? কাদম্বরী যখন হাসে, তখন মুক্তা ঝরে; আলাপ করে, বীণা বাজে; চলিয়া যায়, মৃত্তিকা শিহরে। তার প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে আদিরস উছলিয়া পড়ে, প্রতি কটাক্ষ-বিক্ষেপে বিদ্যুতের তরঙ্গ বহে; প্রতি রোমকূপে আকাঙ্ক্ষার খরজ্যোতি নিয়তই প্রজ্বলিত রহে।

চন্দ্রাপীড়ের সম্মুখেই প্রথম কাদম্বরীর আবির্ভাব। চন্দ্রাপীড়ের অভ্যর্থনা-নিমিত্ত তাহার সেই সভঙ্গীক উত্থান, তাম্বুল প্রদানার্থ সেই সস্বেদ দুরু দুরু কম্প, রূপাতিশয়-দর্শনজন্য সেই উদ্ভিন্ন রোমাঞ্চ, আর প্রথম প্রণয়াবেশ-হেতু সেই সচকিত কটাক্ষ-কাদম্বরীকে বড়ই নয়নাকর্ষক ও উন্মাদক করিয়া তুলিয়াছে। কাদম্বরীর একটি ইঙ্গিতে, একটি কটাক্ষে, একটি অঙ্গভঙ্গীতে যে ভাব প্রকাশ পায়, সহস্রনারীর প্রেমগর্ভ বাণীতে তাহা নাই। অন্তঃপুরিকাগণের হাব ভাব, বিলাস বিভ্রম, ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষ, ইসারা ইঙ্গিত, রসালাপ চাটূক্তির মধ্য দিয়া না যাইলে কাদম্বরীকে বোঝা যাইবে না।

কাদম্বরী চরিত্রটির আগাগোড়াই হৃদয়তত্ত্ব বিশ্লেষণে ভরা। তাহার প্রণয়ারাগের চিত্রটিতে কি সুন্দর রঙই ফুটান হইয়াছে। কাদম্বরীর শয়ন, উত্থান, রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্পন ও স্তম্ভ, কি মনোরম ভাবেই ফেনাইয়া ফেনাইয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কুমারীপুর, ক্রীড়া-পর্বত, কুঞ্জবন, মর্মর-

বেদী, চন্দ্রোদয় ও প্রাতঃকালের ছবি কি মনোহররূপেই অঙ্কিত হইয়াছে। কাদম্বরীর সকলই সুন্দর, সকলই উন্মাদক, সকলই অপূর্ব্ব। ছলা কলা চাতুরী, আচার ব্যবহার, শিষ্টাচার সভ্যতা সকলই অদ্ভুত, হৃদয়োত্তেজক। প্রগল্‌ভরসিকা সখীদের সঙ্গে যার নিয়ত সহবাস, প্রেম-গীতির লীলায়িত মূর্চ্ছনায় সর্ব্বদা যে বিভোরা, সেই কাদম্বরীই চতুরা, বিলাসিনী, প্রখরবুদ্ধিমতী না হইবে কেন ? কবি বলিয়াছেন "বালা হইয়াও সে মন্মথ-জননী।"

কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের গোপন প্রণয়লীলা ফল্গুর মত হৃদয়-বালুকার মধ্য দিয়া বহিয়া চলিল। মধ্যে মধ্যে এক একটি তরঙ্গের উচ্ছ্বাস সেই বালুকা ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এ প্রণয়লীলার বিশেষত্ব,—কাদম্বরী নিজে বড় কোন কথা কহিত না। মনোভাব বুঝিয়া ভ্রূর মৃদু চলনেঙ্গিত পাইয়া মদলেখাই যাহা বলিবার বলিত। তাহার বিলাসেঙ্গিতে ভাবভঙ্গীতে অবশ্য কিছু কিছু প্রকাশ পাইত মাত্র। প্রণয়ের এই লুকোচুরি খেলা বড়ই উপভোগ্য। এই লুকোচুরি গোপনেই রহিল; কেহ কাহারও নিকট মুখ খুলিল না। এইরূপে আশা নিরাশা, নিশ্চয় সন্দেহ, প্রণয় বিরহ, হর্ষ বিষাদের মধ্য দিয়াই কাদম্বরীর প্রণয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পিতার পত্র পাইয়া চন্দ্রাপীড়কে অকস্মাৎ রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে হইল। কাদম্বরীর সহিত সাক্ষাতের আর সময় নাই; পত্র পাঠাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চন্দ্রাপীড় বিদায় শেষ করিয়া লইল। বিদায়-দৃশ্য আর আমাদের দেখা হইল না। দুইজনের মধ্যে আর কাহাকেও মুখ খুলিতে হইল না।

নির্ব্বিলাস তপোবনের মধ্যে থাকিয়া, পিতৃপরবশা হইয়াও শকুন্তলা দুষ্মন্তকে আত্মদান ও দেহদান করিতে বাধ্য হয়, আর বিলাসপূর্ণ কুমারীপুরে বাস করিয়া একপ্রকার স্বাধীনতা-প্রাপ্তা হইয়াও গন্ধর্ব্বাধিপ-

নন্দিনীকে আত্মদান দূরে থাক, মৌখিক প্রণয়-প্রকাশ পর্য্যন্ত করিতে হইল না। চন্দ্রাপীড় যদি পিতার পত্র পাইয়াও কোন ছলে গন্ধর্ব্ব-পুরীতে থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে কাদম্বরী কি করিত—সে বিচারে এখন আর আবশ্যক নাই।

চন্দ্রাপীড় চলিয়া যাওয়ার পরে পত্রলেখা কিছুদিন কাদম্বরীর অনুরোধে তাহার নিকট থাকিয়া গেল। কাদম্বরী পত্রলেখার নিকট আপনার অন্তরের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল। মহাশ্বেতা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত শ্রদ্ধার পাত্রী, আর সে এখন যোগিনী সন্ন্যাসিনী; মদলেখা পরিজনের মধ্যে হইলেও দাসী মাত্র। কাদম্বরী হৃদয়ের গোপন ব্যথা আর কাহাকে জানাইবে? পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গিনী, সখী—তাই সে আজ প্রিয়া। আর কাদম্বরীর প্রণয়-কাহিনী চন্দ্রাপীড়ের নিকট গিয়া প্রকাশ করিবে—তাই সে প্রিয়তমা। প্রিয়তমের নিকট এই প্রেম নিবেদন করিয়া কাদম্বরীর মনের ভার লাঘব হইল; প্রণয়িনীর ইহাতেই আত্মতৃপ্তি। পত্রলেখা ভরসা দিল—"আমি পাদপঙ্কজ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তোমার হৃদয়-দয়িতকে আমি সত্বরই আনিয়া দিব।" মিলনে যে প্রেম গুপ্ত থাকে, বিরহে তাহাই শতমুখে উৎসারিত হয়—ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। পত্রলেখা ফিরিয়া গিয়া কাদম্বরীর অবস্থা চন্দ্রাপীড়ের নিকট বিবৃত করিল। কি উন্মাদক সে ভালবাসা, কি হৃদয়-বিদারক মর্ম্মবেদনা, কিবা কাতর আকুল আহ্বান!

সকলেই ফিরিয়াছে কিন্তু বৈশম্পায়ন কোথায়? সে ত ফিরে নাই! পিতৃ-আদেশে চন্দ্রাপীড়কে অচ্ছোদ-সরসী-তীরে আবার যাত্রা করিতে হইবে—কি সুখময়ী যাত্রা সে! কাদম্বরীর প্রণয়লাভ আজ সার্থক হইবে, জীবন্ত প্রভাতরূপ জ্যোতি আজ হৃদয়ের উপর স্থিরভাবে বিরাজ করিবে—কি সুখ সে!

বড় সাধে বড় আশায় চন্দ্রাপীড় পূর্ব্বপরিচিত অচ্ছোদ সরসী-তীরে মহাশ্বেতা আশ্রমে উপস্থিত। একি, বৈশম্পায়ন আর নাই! প্রিয় সখার সেই কমনীয় তনু আজ মহাশ্বেতার অভিশাপে ভস্মীভূত। অকার্য্যকারী প্রাণপ্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর জন্য চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে কিছু বলিল না, কোনও অনুযোগ করিল না। কি মহানুভবতা, কি সুবিচার, কি আত্মোৎসর্গ!

"দেবী কাদম্বরীর সেবাসুখ লাভ করা এ জন্মে আর হইবে না, জন্মান্তরে যেন লাভ করিতে পাই"—বলিতে বলিতে চন্দ্রাপীড়ের স্বভাবসরস হৃদয় স্ফুটিত হইয়া গেল।

কবি বলিলেন—"কাদম্বরী–সমাগমাপ্রাপ্তি-দুঃখেনৈব ভেদোন্মুখং মুকুলমিব স্বভাবসরসং হৃদয়মস্ফুটৎ।"

এদিকে কাদম্বরী প্রিয়তমের আগমন সংবাদ পাইয়া মহাশ্বেতা আশ্রমে উপস্থিতা। হর্ষ, সুখ, মান, অভিমান, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা লইয়া রাজকুমারী হৃদয়-দয়িতের দর্শন আশায় প্রধাবিতা—যাইয়া দেখে—তাহার প্রাণপ্রিয় চন্দ্রাপীড় "উৎখাত-বীজকোষ" পদ্মের মত, ফলকুসুমশূন্য উপবনের মত ও চন্দ্রবিরহিত নিশামুখের মত প্রাণশূন্য নিপতিত।

সেই বিলাসিনী যৌবনমদ-মত্তা কাদম্বরীর নিমিষের মধ্যে এক মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। নয়নে অশ্রুধারা নাই বরং সহমরণের সুদৃঢ় সংকল্পে মুখখানি নির্ব্বিকার ও প্রশান্ত। চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যুর জন্য সখী মহাশ্বেতাকে কারণ ভাবিয়া কাদম্বরী কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইল না—মহানুভবতার প্রকৃতিই এই, সখী-প্রেমের জলন্ত নিদর্শনই এই! বাস্তবিক কাদম্বরী-চরিত্রের এইস্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব। পুণ্ডরীককে মৃত দেখিয়া সংযমশীলা মহাশ্বেতার প্রাণভেদী ক্রন্দনে সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে, আর এই যৌবন-বিলাসিনী কাদম্বরী প্রিয়তমের মরণে ক্রন্দন করিল না—বরং সহমরণে কৃতচিত্তা হইয়া রহিল।

রঘুবংশে—অজরাজার, কুমারসম্ভবে—রতিদেবীর, উত্তর-চরিতে—রামচন্দ্রের, নৈষধ-চরিতে—স্বর্ণ হংসের বিলাপ অনেকেই শুনিয়াছেন, আর আজি কাদম্বরীর বিলাপ শুনুন। সহমরণে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া কাদম্বরী মদলেখাকে যাহা বলিয়া গেল—যেমন স্বাভাবিক, তেমনই কবিত্বময়, তেমনই মর্ম্ম-বিদারক।

"সখি, বাবা মা রহিলেন, দেখিও। আমি যাহাকে যে চক্ষুতে দেখিতাম, তুমি তাহাকে সেই মতই দেখিও। * * * আমার চরণ-তললালিত—অশোক তরুটির পত্র পল্লব, দেখিও, যেন কেহ কর্ণপূর করিবার জন্য না ছেঁড়ে; সহকার তরুটির সাথে আমার সেই বড় সাধে রোপিতা মাধবী লতাটির বিবাহ দিও। আমার স্বহস্ত-বর্দ্ধিতা মালতীলতা কুসুমিতা হইলে তাহার ফুল দিয়া যেন কেবল দেব-পূজাই করা হয়। "কালিন্দী" সারিকা, "পরিহাস" শুকটিকে পিঞ্জর বন্ধন হইতে মুক্ত করিও—তাহারা যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া যাক্। সেই নকুলিকাকে (বেজী) ক্রোড়ের উপর করিয়া নিদ্রা যাইও। সেই জীবঞ্জীব মিথুন, সেই হংস দম্পতির যেন কোন বিপদ না ঘটে। সেই ক্রীড়াপর্ব্বত, যাহাকে ইচ্ছা দান করিও, আর সেই বীণাটী, তুমি নিজে বাজাইও।"

মহাশ্বেতার নিকট গিয়া তাহার কণ্ঠ ধরিয়া বলিতে লাগিল—"প্রিয় সখী, তোমার প্রত্যাশা আছে, তাই তুমি মরণের অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সমাগমের আশায় বাঁচিয়া আছ। আমি কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিব? জন্মান্তরে যেন আবার তোমাকে প্রিয়সখী-রূপে পাই।"

তারপর কাদম্বরী প্রিয়তম চন্দ্রাপীড়ের দেহের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সেই নিস্পন্দ দেহের শীতল স্পর্শে—আজ এই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তেও তাহার দেহে পুলক ফুটিয়া উঠিল। তখন সেই উন্মাদিনী

বালা আপনার শিথিলকবরী-চ্যুত পুষ্পরাশি দিয়া পতিপদ পূজা করিল; ধীরে ধীরে সে চরণ ক্রোড়ের উপর তুলিয়া লইয়া স্তম্ভিতাবৎ বসিয়া রহিল। বড় আনন্দময়ী, বড় চতুরা, বড় বুদ্ধিমতী যে, আবাল্য দুঃখ সহনে অনভ্যস্তা যে, সেই নারীর কি এই শোক-মূর্ত্তি? শোকে এমন স্থিরা, দৃঢ়া, মরণে এমত কৃতসংকল্পা সতী নারীর দৃশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ নহে। বাঙ্গালার কবি কি এই দৃশ্যটিই মৃণালিনী উপন্যাসে মনোরমার সহমরণ কালে ফুটাইয়াছেন?

কাদম্বরীর স্পর্শে "সমুচ্ছ্বসিতাদিব দেহাৎ" প্রিয় দেহ হইতে এক "চন্দ্রধবল" জ্যোতি উর্দ্ধে উত্থিত হইল। দৈববাণী শোনা গেল—"চন্দ্রাপীড়ের পুনর্জ্জীবন লাভ হইবে"।

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাটি তৈলবিন্দু পাইয়া জ্বলিয়া উঠিল। শুষ্কপ্রায়া মাধবীলতাটি বর্ষার বারিসেকে পুনরুজ্জীবিত হইল। কাদম্বরী-স্পর্শে সে দেহ অবিকৃত থাকিবে, একদিন চন্দ্রাপীড়ের দেহে জীবন ফিরিয়া আসিবে —এই বিশ্বাসে সে শিথিলবৃন্ত কুসুমবৎ আপনার জীব-কুসুমটীকে কোন মতে ধরিয়া রাখিল। সেই ভোগময়ী প্রবৃত্তি আজ নিবৃত্তিরূপা হইয়া মহাশ্বেতার মতই বাঁচিয়া রহিল।

মহাশ্বেতা-প্রিয় দেহ পায় নাই, কাদম্বরী প্রিয় দেহ পাইয়াছে— কাজেই সে মহাশ্বেতার মত বীণা বাজাইয়া, শিবারাধনা করিয়া, প্রিয় স্মৃতিচিহ্ন লইয়া জীবন কাটাইবে কেন? সে যে প্রিয়তমের স্পৃহনীয় দেহটী তাহারই সৌভাগ্য দেবতার বরে লাভ করিয়াছে। তাই সে বড় যত্নে সেই প্রিয়তম-দেহ চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া, বিঘ্ন বিপদ হইতে রক্ষা করে। সে জীবন্মৃতা হইয়া ঐ অবলম্বনটী লইয়া বাঁচিয়া রহিল; মহাশ্বেতার মত বীণা বাজাইয়া, প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া, বনের ফুল তুলিয়া মহাদেবের পূজা অর্চ্চনা লইয়া থাকিতে পারে না। ঐ জাতীয় সংযম শক্তি

তাহার নাই। গাঢ় তাপে অতপ্তা জলনলিনীর মত সে মুখখানি লুকাইয়া রাখিতেই ভালবাসে। যাহার যাহা প্রকৃতি।

অভিশাপের শেষ দিন। বসন্তকালে পূর্ণিমার শেষ রজনীতে মলয় পবনের শিহরণে শিহরিয়া উঠিয়া কাদম্বরী উন্মত্তার মত চন্দ্রাপীড়কে অকস্মাৎ একদিন আলিঙ্গন করিল। সেই মৃতসঞ্জীবন-স্পর্শেই যেন সেই মৃতদেহ সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রাপীড় চাহিয়া দেখিল, কাদম্বরী উন্মাদক আলিঙ্গনে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

চারিটী অতৃপ্ত প্রাণীর মুখে তখন মিলনের স্বচ্ছ হাসি—কি সুন্দর দৃশ্য! বিষাদের করুণ সঙ্গীতের পর মিলনের এ সুখ রাগিনী—বড় শ্রুতি-সুভগ! ইহা প্রাণ-ঢালা ভালবাসারই পুরস্কার, প্রাণপাত সাধনার ফল। ইহা মহত্ত্বের জয়, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

উত্তর-রামচরিত

(প্রথম অঙ্ক)

উত্তররামচরিত নাটক ভবভূতি কবির গৌরবের মর্ম্মর প্রাসাদ। সংস্কৃত নাট্যাকাশে ইহা ষোলকলা শশধর। সকলরসে সর্ব্ববিধভাবে এ তটিনী সর্ব্বদাই কানায় কানায় পরিপূর্ণ। করুণ-রসে ইহা মধুর, রৌদ্র-রসে ইহা উৎকট। রামচন্দ্রের জীবনের প্রথমভাগ—মহাবীর-চরিতে, উত্তর অর্থাৎ শেষভাগ—এই উত্তররামচরিতে বর্ণিত।

নাট্যকলাবিচারে কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" পরই ইহার স্থান। অভিনয়ে এই নাটক শ্রোতৃগণের হৃদয়ে ঝটিতি প্রভাব বিস্তার করে। অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসনে—ইহা "বিপ্রলম্ভ করুণাখ্য" আদিরসের অন্তর্গত নাটক। রসের অনুযায়ী ভাষা-বিন্যাসে, অক্ষর-সন্নিবেশে ইহার তুলনা নাই। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক শেষ হইয়াছে। সুগ্রীব বিভীষণাদি বন্ধুরা, নানা প্রদেশের নরপতিরা, ব্রহ্মর্ষি, মুনি ও বেদাবৎ ব্রাহ্মণেরা সে অভিষেকোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; অভিষেক শেষ হওয়ায় তাঁহারা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। উৎসব-কোলাহলে মুখরিত—অযোধ্যানগরী যেন এখন মূক ; তরঙ্গোচ্ছ্বাসে টলমল—রাজধানী যেন এখন সৈকত-ভূমির অবস্থায় উপনীত। বীরবৃন্দের জয়োল্লাস নাই, রাক্ষস বানরের তাণ্ডব নৃত্য নাই ; বীরবৃন্দের পদভরে নগরীর পথ আর কম্পিত হয় না। এইস্থান হইতেই নাটকের আরম্ভ।

রাজমহিষী সীতাদেবীর পিতা "সীরধ্বজ" জনক, রাজা হইয়া ঋষি, রাজর্ষি, আহিতাগ্নি ও যাগশীল। যাজ্ঞবল্ক্য-শিষ্য, উপনিষদের জনক রাজার ইনি বংশধর, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির তুল্যরূপই সেবক, অনুশীলনের

ইনি জীবন্ত বিগ্রহ; নিত্য অনুষ্ঠানের কার্য্য করিয়াও স্নেহবশে ইনি কয়েকদিন উৎসবে আসিয়া সম্প্রতি বাধ্য হইয়া রাজ্যে মিথিলায় ফিরিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য সীতাদেবী বড়ই ম্রিয়মানা; তাহার কোমল চিত্ত বড়ই কাতর। পত্নীবৎসল রামচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অন্তঃপুরে সমাসীন। এদিকে দশরথের ঔরসজাতা, লোমপাদের পালিতা কন্যার স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞে ব্যাপৃত আছেন। বশিষ্ঠদেব, অরুন্ধতী ও কৌশল্যাদি রাজ্ঞীরা সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণে তথায় গিয়াছেন। প্রকারান্তরে কবি সীতা-বিসর্জ্জনকালে গুরু, গুরুপত্নী ও রাজ্ঞীদের অযোধ্যা হইতে সরাইয়া রাখিয়াছেন। ভবভূতির রামচন্দ্র যেরূপ কোমলপ্রকৃতি— তাহাতে তাঁহার পক্ষে গুরু, গুরুপত্নী ও জননীদের উপস্থিতিতে সীতানির্ব্বাসন করা সম্ভবপর ছিল না। বাল্মীকির দৃঢ়-প্রকৃতি কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ন রামচন্দ্রে যাহা মানাইয়াছিল, ভবভূতির কোমলস্বভাব স্নেহার্দ্র-কর্ত্তব্যতাসেবী রামচন্দ্রে তাহা মানাইত না। বশিষ্ঠদেবের উপদেশ, অরুন্ধতীর ভর্ৎসনা, রাজ্ঞীগণের সাশ্রুনয়নের নিষেধ অতিক্রম করা রামচন্দ্রের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল।

এইগুলি উপেক্ষা করিয়া সীতানির্ব্বাসন করা বা নির্ব্বাসন ব্যাপারে এইগুলি উপেক্ষা করা ভবভূতির রামচন্দ্রের পক্ষে প্রকৃতই সম্ভব হইত না। এই অভিনব রামচরিত-সৃষ্টির মধ্যস্থলে এ প্রকার বাধা আনিয়া উপস্থিত করা প্রতিভাবান্ কবি ভাল মনে করেন নাই। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইলেও ইহাতে কখনই রামচরিত্রের মাধুর্য্যটুকু কিন্তু রক্ষা পাইত না। রামায়ণের রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে ডাকিয়া বিচারকের মত বিচার করিলেন, লক্ষ্মণকে স্থির ও ধীরভাবে সীতার বনবাস আজ্ঞা দিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের উপদেশ ও নিষেধ, অরুন্ধতীর ভর্ৎসনা ও অনুরোধ, রাজ্ঞীদের অশ্রুজল ও হাহাকার রামায়ণের রামচন্দ্রকে

টলাইতে পারিত না। ভবভূতির ও রামায়ণের রামচরিত এক নহে, কাজেই অযোধ্যা হইতে অপসারণ-রূপ এই সাবধানতা এক সামগ্রী নহে।

ভবভূতির সৃষ্ট সীতাও তাঁহার রামচন্দ্রের অনুরূপা। তাঁহার রাম চরিত্র যেমন প্রেমে কোমল, বিপ্রলম্ভ-করুণে দুর্ব্বল, সীতাও তদ্রূপ প্রেমে বিহ্বলা, বিষাদে মুহ্যমানা ও ভয়ে একেবারে আত্মহারা। সেই রামায়ণের তেজস্বী মহিমময়ী রাজ্ঞী এস্থানে "ত্রস্তৈক-হায়ণ-কুরঙ্গ বিলোলদৃষ্টি।" সীতা মুগ্ধা নায়িকা, করুণরসের জীবন্ত মূর্ত্তি, মাধুর্য্যের স্বপ্নময়ী পুষ্পরাণী।

রামায়ণের সীতা লঙ্কেশ্বর রাবণকে সম্মুখে দেখিয়াও ভয়ে আত্মহারা হয় নাই বরং সিংহীর মত গর্জ্জিয়া তীব্র ভর্ৎসনা করিতে থাকে; কুক্কুরের এ হবিভক্ষন লালসা—বলিয়া নানারূপ অপমান করিতেও কুণ্ঠিতা হয় নাই—পতিগর্ব্বে গরবিণী, সতীত্বের তেজে তেজস্বিনী সীতার সে এক মূর্ত্তি! মারীচ রাক্ষসের কাতর ক্রন্দনে রামচন্দ্রের মৃত্যু-আর্ত্তনাদ স্থির করিয়া লক্ষ্মণকে অকথ্য ভাষা রামায়ণের সীতাই বলিতে পারে এবং বলিয়াও ছিল। আর ভবভূতির সীতা রাবণকে সম্মুখে দেখিবামাত্র কুরঙ্গীর মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, একেবারেই মূর্চ্ছার কোলে ঢলিয়া পড়িল; সতীত্বের গর্ব্ব করিল না, পশুর অধম বলিয়া গালিও দিল না। ভবভূতির সীতায় মানাইত না বলিয়াই লক্ষ্মণের প্রতি রামায়ণের সীতানুরূপ কটূক্তি শোনা যায় নাই। বাঙ্গলার সমালোচক, ভবভূতিরই প্রাপ্য এই সম্মান বাঙ্গলার কবিকে দিয়া গিয়াছেন।

নির্ব্বাসনকালে রামায়ণের সীতার পাঁচমাস গর্ভাবস্থা। নির্ব্বাসন-দণ্ড শুনিয়া সীতা—গর্ভস্থ শিশুর জন্য হউক বা না হউক, আত্মহত্যা করিবার মন করে নাই। ভবভূতির সীতা নির্ব্বাসন-সময়ে পূর্ণগর্ভা—লক্ষ্মণের চলিয়া যাইবামাত্র সজ্ঞানেই "পরিস্ফুরিত-গর্ভভরালসা"

বালা গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিল। গর্ভস্থ শিশুর কথা ভাবিল না—আত্ম-হত্যার জন্য কোন দ্বিধা সঙ্কোচ করিল না—একেবারে গঙ্গা-জলে ঝাঁপিয়াই পড়িল—তৎক্ষণেই যমজপুত্রের প্রসব। রঘুকুল-দেবতা ভাগীরথী আসিয়া শিশুদ্বয়কে বক্ষে ধরিলেন। স্নেহময়ী জননী ধরিত্রী আসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে তুলিলেন। স্তন্য-ত্যাগের পর শিশুদ্বয়কে গঙ্গাদেবী উপনয়ন, বেদবিদ্যা ও শাস্ত্র শিক্ষার-জন্য বাল্মীকির করে অর্পণ করিয়া আসিলেন। সীতা পতিবিরহিনী আর পুত্রদ্বয়ও তাহার নিকটে নাই—এমনই সে অভাগী—পতি বিরহের উপর এই পুত্র বিরহ। তবে কন্যার পাতালে মাতার কাছে অবস্থিতি—ইহাই তাহার সুখ ও সান্ত্বনা। বলা বাহুল্য, রামায়ণের সীতা বাল্মীকির আশ্রমে আর পুত্রদ্বয় তাহার নিকটে। ভবভূতির সীতা প্রকৃতিতে কোমলা ছিলই, তদুপরি কঠোর পূর্ণগর্ভ-ভারে সম্পূর্ণ দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছিল। এমত কোমলা ও দুর্ব্বলা—তাই এতবড় নিন্দিত নির্ব্বাসনদণ্ডের আঘাত সহ্য করিতে পারে নাই। ভবভূতি সে অধিকতর কারুণ্যভাব ফুটাইবেন বলিয়াই যে সীতাকে "প্রাপ্ত-প্রসব-বেদনা" অবস্থায় আনিয়াছেন, তীব্র দুঃখ-শোকের সংবেগে একেবারে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেওয়াইছেন—তাহা ভাবিলে কবি-প্রতিভার অসম্মান করা হয়। কবি রামচন্দ্রকে দেশানুরূপ, কালানুরূপ ও মানুষানুরূপ করিয়াই দাঁড় করাইয়াছেন; সীতাকে সেই রামচন্দ্রের যোগ্য অর্দ্ধাঙ্গিনী না করিলে মানাইবে কেন? তাই তিনি পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে রামচন্দ্রকে নামাইয়াছেন, আবার সীতাকেও উঠাইয়া তাঁহারই পার্শ্বে বসিবার মত করিয়া দিয়াছেন।

আদর্শ নরপতিকে সীতাপতি করিয়া, তেজস্বিনীকে মাধুর্য্যময়ী করিয়া কবি নিজের কোমল মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। স্বপ্নময়ী মোহন-তুলিকা স্পর্শ করাইয়া নূতন সৃষ্টিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামচন্দ্র নূতন রাজা। রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বিনয় পূর্ব্ববৎ আছে, গর্ব্ব অহমিকা লেশমাত্র জন্মে নাই। কঞ্চুকি "রামভদ্র" বলিতে গিয়া অর্দ্ধপথে থামিয়া যেমন মহারাজ বলিল—অমনই রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"আর্য্য, নন্থ রামভদ্র ইত্যেব মাং প্রতি উপচারঃ শোভতে তাত পরিজনস্ত" একটি কথাতেই রামচন্দ্রের বিনয়-নম্র সুন্দর চিত্রটি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঋষিদিগের দ্বার সর্ব্বত্রই অবারিত। বশিষ্ঠ-ঋষ্যশৃঙ্গের সংবাদ আনিয়াছেন—তাই এই রাজান্তঃপুরে আহুত। বশিষ্ঠদেব এবং ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহাদের কি বলিয়া দিয়াছেন, ইহা জানিতেই রামের আগ্রহ অধিক। ননদী শান্তা কি মন্তব্য পাঠাইয়াছে, তাহা শুনিতে সীতার বড় কৌতূহল। সীতার আর ত্বরা সহে না, রমণী-প্রকৃতি সর্ব্বত্রই একরূপ। সীতা প্রশ্ন করিল, "তাঁহারা কি আমাকে স্মরণ করেন? আমি যাই নাই, সেজন্য তাঁহারা কি কিছু অভাব অনুভব করিয়াছেন?" পূর্ণগর্ভা বলিয়া সীতার নিমন্ত্রণে যাওয়া হয় নাই, সেজন্য তাঁহারা কি কোন অভাব অনুভব করিয়াছেন, সে কথা কি কিছু জানাইয়াছেন?—সীতার ইহা জানিবার বড় আগ্রহ। ননদী শান্তার সহিত সীতার বড় মনের মিল ছিল; শান্তার স্বামী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ আজন্মসিদ্ধ ঋষি ছিলেন; কাজেই তাঁহার উপর সীতার ভক্তি থাকিবারই কথা, ছিলও তাই। অষ্টাবক্র ঋষি সীতার কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া অগ্রেই জানাইলেন, "বৎসে, তুমি পূর্ণগর্ভা, এই কারণে তোমাকে আনিতে পারিলাম না; বৎস রাম ঃ ক তোমারই বিনোদনের জন্য তোমার নিকটে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া , একেবারে পুত্রকোলেই তোমা:ক দেখিব"। লজ্জাশীলা সীতা সহসা এ কথার উত্তর দিতে পারে না। ঋষিবর সম্মুখে, পতিদেবতা নিকটে, এ অবস্থায় পুত্রের কথা উঠায় সীতার লজ্জাবশতঃ মৌনত্ব শোভমানই হইয়াছে।

রামচন্দ্র, ভগ্নীপতি ঋষিশ্রেষ্ঠ তাপস ঋষ্যশৃঙ্গের এই সন্দেশটি আশীর্ব্বাদ বলিয়া বুঝিলেন, ইষ্টদেবতার নির্ম্মাল্যের মত নতমস্তকে গ্রহণ করিলেন। তৃপ্তির হাসিতে রামের মুখখানি ভরিয়া উঠিল, লজ্জায় নতনয়না সীতার চক্ষুতে লজ্জাকত্র একটী অম্লান সৌন্দর্য্য দেখা দিল। রামচন্দ্র জানিলেন—

"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনু-ধাবতি।"

গর্ভাবস্থায় যে অভিলাষ জন্মে, তৎক্ষণাৎ তাহার পূরণ আবশ্যক। অষ্টাবক্র বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞা জানাইলেন—"গর্ভদোহদোঽচিরাৎ সম্পাদয়িতব্যঃ।" প্রজারঞ্জনই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহাই রঘুকুলের চিরন্তন রীতি—গুরুর এই উপদেশটিও অষ্টাবক্র রামচন্দ্রকে দিয়া গেলেন। গর্ভদোহদ-রূপেই সীতার বনগমন ইচ্ছা উদিত হইল। প্রজানুরঞ্জনই রাজার ধর্ম্ম—ইহা রামের চিত্তে কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ়তা আনিয়া দিল। সীতাবিসর্জ্জন আকস্মিক উত্তেজনার পরিণাম নহে বা প্রবল মনোবেদনার ফল নহে—তাহা রামের কথাটিতেই প্রকাশ পাইতেছে—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

স্নেহ, দয়া, সৌখ্য, এমন কি জানকীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে আমার কোনই ব্যথা নাই—ইহা হৃদয়ের বাণী; অনুত্তেজিত শান্ত অবস্থায় এই হৃদয়ের বাণীতেই রামের চরিত্র মনোমোহন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামের এই প্রজানুরঞ্জনই লোকারাধনা, ব্রত, তপস্যা ও পরমধর্ম্মপালন। ইহাকে কেবলমাত্র প্রজারঞ্জনী বৃত্তি বলিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিতে পারি না। সীতার সম্মুখে হাসিতে হাসিতে যিনি মনের এই কথা স্পষ্টভাবে বলিতে পারেন—তিনিই আদর্শ রাজা, তিনিই শ্রেষ্ঠ মানব, তিনিই নররূপী দেবতা।

চিত্রদর্শন।

দুর্মনায়মানা সীতার চিত্তবিনোদনের জন্যই লক্ষ্মণের চিত্র-দর্শনের অবতারণা। সীতার চিরপ্রিয় সেই বনভূমি, সেই বনবাস-সঙ্গিনী প্রাণসখী অনসূয়া, জীবনের সুখ ও দুঃখের সঙ্গে ওতঃপ্রোত আত্মজসম সেই তরুলতা, সেই পুত্র-নির্বিবশেষ করিপোত, মৃগশিশু, ময়ূর-শাবক। এ পুরাণচিত্র সীতার প্রিয় না হইয়া যায় না। রামের কথা, রামের ভালবাসা, অভাগী সীতার জন্য রামের সেই দুঃখও সীতার তৃপ্তিপ্রদ না হইয়া পারে না। রামের সহিত শয়নে স্বপনে সেই স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থলী দেখিবার ইচ্ছা হওয়া সীতার স্বাভাবিক।

বিরহের পর রামের সেই পাষাণবিদ্রাবী ক্রন্দন, ইহা সীতারই জন্য সীতার ভাল লাগাই স্বাভাবিক ; কাজেই চিত্রদর্শন সীতার বড় তৃপ্তিকর।

প্রথম উদ্দেশ্য—

এই চিত্রদর্শনে রাম-সীতার বিরহের দৃশ্য সম্যক্‌রূপে ফুটান হইয়াছে। এ বিরহ প্রকৃত উপলব্ধি করিতে না পারিলে সীতা বিসর্জ্জনটির প্রকৃত স্বরূপই বোধগম্য হইবে না। আবার এই বিরহ সম্যক্ বুঝিতে হইলে উভয়ের মিলনের দৃশ্য—পলকে আত্মহারা, সুখাবেশে বিহ্বলতা—এই ভাবটিও ফুটান আবশ্যক।

রামসীতার বিরহ উপলব্ধির জন্যই চিত্রদর্শনে মিলন-দৃশ্যের অবতারণা—ইহা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উত্তর-চরিত সমালোচনায় ভালরূপেই বুঝাইয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে চিত্রদর্শনে মিলন দৃশ্য যেমন দেখান আছে, বিরহ দৃশ্যও তদ্রূপ, বরং তদপেক্ষা উজ্জ্বলভাবেই দেখান হইয়াছে। তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতটি আমরা পরিস্কৃত ও সংশোধিত আকারে দেখাইতে চাহি,—

সীতা-বিসর্জ্জন বুঝিতে হইলে রামসীতার মিলন-দৃশ্যের যেমন অবতারণা আবশ্যক, পূর্ব্বকার বিরহ-দৃশ্যেরও (সীতাহরণাত্মক) অবতারণা সেইরূপ, বরং তদপেক্ষা অধিকই আবশ্যক। পত্নীমরণে বা চির-বিসর্জ্জনে কি মর্ম্মান্তিক শোক—তাহার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে পত্নীর প্রতি ভালবাসা এবং পত্নী-অদর্শনে বিরহযাতনাটিরও মর্ম্ম বোঝা প্রয়োজন। বিরুদ্ধ ও স্বজাতীয় দুইটি দিক্ দিয়াই বস্তুটি বোঝা চাই। অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখ, এই দুইটি দিকে দার্শনিকেরা বুঝাইয়া থাকেন।

রাম সীতার পূর্ব্বকার সীতাহরণ-বিরহের নাম দেওয়া যাউক—ছোট বিরহ। বর্ত্তমান সীতা নির্ব্বাসাত্মক বিরহেরও নাম দেওয়া হইল—

বড় বিরহ।

সীতাহরণ-জন্য বিরহ সীমাবদ্ধ—রাবণবধেই সে বিরহের অবসান, আর ইহা প্রতিকারার্হ বলিয়া সহ্যের অতীত নহে। এই ছোট বিরহে আশা আছে—সীতার সহিত একদিন মিলন হইবেই। আশা থাকিলেই সকলই থাকে, আশা ফুরাইলেই সকলই ফুরায়।

"আশাবন্ধো জীবয়তি।"

সীমাবদ্ধ ও প্রতিকারার্হ সীতাহরণ-জন্য বিরহ এমন মর্ম্মভেদী—যাহাতে পাষাণ দ্রবীভূত হয়, বনের পশুপক্ষী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকে—তাহা হইলে নিরবধি ও অপ্রতিকার্য্য সীতানির্ব্বাসন-জন্য বিরহ কত মর্ম্ম-ভেদী ও যন্ত্রণাকর—তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

তবেই রামসীতার প্রণয়, সীমাবদ্ধ হরণ-জন্য বিরহ, আর নিরবধি-নির্ব্বাসন-বিরহ—তিনটিই চিত্র দর্শনের বিষয় হওয়া উচিত। রাম সীতাকে কিরূপ ভাল বাসিতেন এবং তাহাকে হারাইয়াই কিরূপ উন্মত্তের মত আত্মহারা হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেন—

তাহার সমুজ্জ্বল ছবিটি চিত্রদর্শনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীমাবদ্ধ, আশান্বিত বিরহের পার্শ্বে অসীম, আশাশূন্য বিরহ অধিকতর সমুজ্জ্বল দেখাইয়া থাকে।

সীতাহরণ-বিরহ দৈবকৃত আকস্মিক ঘটনা। সীতানির্ব্বাসন-বিরহ স্বহস্ত-সম্পাদ্য, কাজেই আত্মহত্যাতুল্য—এ নির্ব্বাসন-বিরহে আবার মর্ম্মান্তিক লজ্জা সংমিশ্রিত। হরণ-বিরহে কাঁদিবার উপায় ছিল—সেই কারণে দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম হইত। নির্ব্বাসন-বিরহে কাঁদিবারও উপায় নাই বলিয়া তাহা মর্ম্মান্তিকভাবে কেবল অনুভূতিরই গম্য। প্রথমটিতে, রাবণবধাদি বহুকার্য্য ছিল, তজ্জন্য দুঃখশোকের তাদৃশ অবসর ছিল না। আর দ্বিতীয়টিতে, সীতার জন্য করিবার কিছুই নাই, তাহার উপর আবার গুরুভার রাজকার্য্য। বহ্নি ও গঙ্গোদকবৎ পবিত্র জানিয়াও সীতাকে লোকচক্ষুতে কলঙ্কিনীর মত পূর্ণগর্ভাবস্থায় নিন্দিত নির্ব্বাসন-দণ্ড দেওয়ার যে যাতনা—তাহার শতাংশের একাংশ হরণ-বিরহে ছিল না।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—

ভবভূতি প্রথমে রামের বাল্যচরিত, 'মহাবীরচরিত' নাটকে বর্ণিত করিয়া অবশেষে অবশিষ্ট চরিত—বর্ণনার জন্য উত্তররামচরিত নাটক প্রণয়ন করেন। রামচরিতে পূর্ব্বার্দ্ধ সংক্ষেপে বর্ণনা না করিলে উত্তর-রামচরিতের শেষার্দ্ধটির শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য থাকে না। বিশেষতঃ উত্তরচরিত নাটকটি স্বতন্ত্র নাটকরূপেও পরিগণিত হয় না। চিত্রদর্শনচ্ছলে বাল্য-চরিতটি প্রকারান্তরে বর্ণনা করাও হইল।

ভবভূতি প্রথম মহাবীর চরিতে বাল্মীকি-প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করত. সম্পূর্ণ পৃথক পথ অবলম্বন করেন—ফলে, নাটকখানির সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, রসসমুদ্রটি লবণাক্ত জলে পূর্ণ হইয়া যায়; শেষে উত্তরচরিত

প্রণয়নের কালে মহাবীরচরিতের অননুসৃত পথ ছাড়িয়া দিয়া রামায়ণের চিরন্তন পথই গ্রহণ করিলেন।

মহাবীরচরিতে কৃত দোষগুলির পুনরুদ্ধার কি ভাবে করা হইয়াছে—তাহারই দুই চারিটি স্থল দেখাইতেছি মাত্র। মহাবীরচরিতে জনকভ্রাতা "কুশধ্বজ" বিশ্বামিত্র-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া সীতা ও উর্ম্মিলা সহ যজ্ঞস্থলে উপনীত। হরধনু যজ্ঞস্থলেই সুরক্ষিত—বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় সেই স্থানেই রামকর্ত্তৃক হরধনু-ভঙ্গ। তৎপরে মিথিলাতেই বিবাহ-উৎসব আর বিবাহোৎসব সভাতেই বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ ও জনকের সম্মুখেই ভার্গবের আগমন—সেইস্থানেই তাঁহার পরাজয়।

উত্তর চরিতে চিত্রদর্শন প্রস্তাবে যেভাবে বাল্যচরিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা রামায়ণেরই অনুরূপ। "এষ মিথিলা-বৃত্তান্তঃ" এইবার মিথিলা বৃত্তান্ত আরম্ভ। তার পরই সীতার উক্তি—"অনাদরখণ্ডিত-শঙ্করশরাসন আর্য্যপুত্র আলিখিত ইতি"—হরধনু মিথিলাতেই ভঙ্গ হইল। "অয়ঞ্চ ভগবান্ ভার্গব" এই ভগবান্ ভার্গব। তারপরই আবার "এতে বয়মযোধ্যাং প্রাপ্তাঃ" এই আমরা অযোধ্যায় আসিলাম—পথিমধ্যেই ভার্গবের আগমন দেখা গেল।

মহাবীরচরিতে রাবণের মাতামহ মাল্যবান্ নামধেয় একজন রাজনীতিজ্ঞের অবতারণা আছে; রাবণের কূটবুদ্ধিমন্ত্রী মাল্যবান্ সীতাকে রাবণের করে অর্পণ করিবে বলিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একজন দূতকে মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহাতে অবশ্য লোভ দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধারের ইঙ্গিতও ছিল; তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল; সাম, দান দণ্ড নীতির কোন ফলই ফলিল না। কূটমন্ত্রী তখন ভেদনীতি চালাইয়া রামের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিল। শূর্পণখা জাল-মন্থরা সাজিয়া দশরথ-নামাঙ্কিত এক জাল পত্র, যৌবরাজ্যাভিষেকক্ষেত্রে রামের হস্তে

প্রদান করিল; তাহাতে কৈকেয়ীর দুইটী বর প্রার্থনা ছিল; একটী—ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি; দ্বিতীয়—সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ-বর্ষ বনবাস। মন্ত্রীর ইহা একটী কূট চাল।

রাক্ষসকুল-নাশ রামের ব্রত। তজ্জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে নিরাশ্রয় অবস্থায় বনমধ্যে হত্যা করাই মাল্যবানের এই ভেদনীতি-প্রয়োগের উদ্দেশ্য; সীতাকে হরণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের মৃতপ্রায় করাও অন্যতম প্রয়োজন।

তৃতীয় উদ্দেশ্য—

উত্তরচরিতে ভবভূতি কোন কোন স্থলে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, অবশ্য তাহাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া নবীন সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিতে সক্ষমও হইয়াছেন। যে নূতন পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, চিত্রদর্শনের মধ্যেই তাহার পূর্ব্ব-সূচনার বীজটি সযত্নে উপ্ত করিয়া রাখিয়া দিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চমাঙ্কে লবের জন্মসিদ্ধ জৃম্ভকাস্ত্র-প্রাপ্তির কারণটি একস্থলে বরদান উপলক্ষে ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন—

"সর্ব্বথেদানীং ত্বৎপ্রসূতিমুপস্থাস্যন্তি"

এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারে জম্ভকাস্ত্রবিদ্যা তোমার সন্তানে সংক্রমিত হউক।

রামায়ণে সীতা লবকুশ-সহিত বাল্মীকি-আশ্রমেই প্রতিপালিতা। উত্তরচরিতে কিন্তু সীতা জননী বসুন্ধরার গৃহে পাতালে অবস্থিতা। লবকুশ স্তন্যত্যাগের পর হইতে বাল্মীকি আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত। উত্তরচরিতে সীতার পতিবিরহ ও পুত্রবিরহ দুইই।

রামায়ণে পাঁচমাস গর্ভাবস্থায় সীতার বিসর্জ্জন। উত্তরচরিতে "আতঙ্কস্ফুরিত-গর্ভগুর্ব্বী" পূর্ণগর্ভা সীতার নির্ব্বাসন। ভবভূতির সীতা যেরূপ শিরীষকোমল উপাদানে গঠিতা, তাহাতে তাহার পক্ষে এরূপ

নিশ্চিত নির্ব্বাসন-দণ্ড সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। রামায়ণের সীতা কোমলা ও কঠোরা—মাধুর্য্যের ছবি, তেজস্বিতার মূর্ত্তি। রামায়ণের সীতা রাবণকে লঙ্কেশ্বর রাক্ষস জানিয়াও নির্ভীকচিত্তে তীব্র ভর্ৎসনা করে, ভবভূতির সীতা কিন্তু সেই রাবণকে দেখিয়াই কুররীর মত কাঁদিয়া উঠে। লক্ষ্মণ ফিরিয়া যাইলে পর রামায়ণের সীতা রামের গর্ভস্থ সন্তানটিকে রক্ষা করাই তাহার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—এই বুঝিয়া আত্মহত্যার সংকল্প পর্য্যন্ত করে নাই; ভবভূতির সীতা লক্ষ্মণ প্রত্যাগত হইবামাত্র তীব্রশোক-ক্ষোভের সংবেগে একেবারে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেয়। রঘুকুল-দেবতা গঙ্গাদেবী অমনই বক্ষের পর সীতাকে তুলিয়া লইল; সেই স্নেহময়ী দেবীর কোলেই সীতার যমজপুত্র কুশলব জন্মগ্রহণ করিল। গঙ্গাদেবী মূর্চ্ছিতা সীতাকে মাতা বসুন্ধরার নিকট রাখিয়া আসিয়া রঘুকুলের আদি-জননীরই কার্য্য করিয়াছিলেন।

চতুর্থ উদ্দেশ্য—

প্রকারান্তরে "বধূসহবাস-বিশ্রব্ধ সাক্ষী" পঞ্চবটীর, "গদগদ নদদ্গোদাবরী" নদীর, "বহুনির্ঝর-কন্দর" প্রস্রবণ-গিরির ও স্নিগ্ধশ্যাম "ভীষণাভোগ-রুক্ষ" দণ্ডকারণ্যেরও বর্ণনা করা হইল। সেই পুত্রনির্ব্বিশেষে লালিতপালিত মৃগশিশু, ময়ূরশাবক ও করিপোত প্রভৃতির চিত্রগুলিও দেখান হইল। কবির ইন্দ্রজাল-পিচ্ছিকাবৎ বিচিত্র তুলিকার স্পর্শে জড়ও চেতন হইয়া উঠিল; পশু পক্ষীগুলি পর্য্যন্ত মানবমানবী আকারে দেখা দিল। পঞ্চবটী, গোদাবরী, দণ্ডকারণ্য ও প্রস্রবণগিরি যে না দেখিল—তার পক্ষে রামসীতার অলৌকিক প্রণয় উপলব্ধই হইল না; করিপোত, ময়ূরশিশু, মৃগশাবক যে না দেখিল, সে সীতা-চরিত্র কিছুই বুঝিল না! সীতার কি স্নেহ ও সহানুভূতি—পশুপক্ষী, গিরিনদী ও অরণ্যে ছড়াইয়া আছে—এ কে

না দেখিল—সে সীতাকে কি বুঝিবে? যে সীতাকে না বুঝিল—সে তাহার প্রেম বিরহের, কি ইয়ত্তা করিবে? সীতা-বিসর্জ্জন কি বস্তু, তাহাই বা সে, কি উপলব্ধি করিবে? সীতার প্রতি রামের ভালবাসা, সীতার বিরহে রামের কষ্ট কেমন—ইহা যে না বুঝিল—সে রামের সীতা-বিসর্জ্জনের কি বুঝিবে? সীতাবিসর্জ্জন যে না বুঝিল—তাহার উত্তরচরিত পাঠই বৃথা।

পঞ্চম উদ্দেশ্য—

রামই সীতার সর্ব্বস্ব—রাম কাছে থাকিলে সীতার কাছে শ্মশানও নন্দনবন, অরণ্যও রাজান্তঃপুর, মর্ত্ত্যও স্বর্গ। রামের ভালবাসা, রামের কথা, রামের স্মৃতি, রামের দুঃখ—পতিগতপ্রাণা সীতার বড় প্রিয়। সীতা কি চাহে, কি ভালবাসে, কি দেখিলে ও শুনিলে তৃপ্তি পায়—লক্ষ্মণের এ সকল ভালরূপই জানা আছে। বনগমন-স্পৃহা সীতা বহুদিন হইতেই মনে মনে পোষণ করে, সেই স্পৃহা এক্ষণে চিত্রদর্শনের ফলে আকুলতায় পরিণত হইয়াছে মাত্র। সীতার বড় সাধ—সেই ঋষিকন্যা-গণকে, সেই বাসন্তীকে, সেই পশুপক্ষী ও তরুলতাদের আবার দেখে।

সীতার মনে হইতেছিল—করিপোতটি যেন তাহার কর্ণপূর হইতে লবলীপল্লব আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। নেত্রপথে ভাসিয়া উঠিতেছিল—যেন ময়ূর-শিশুটি করতালির সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলাকারে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। সীতা তখন এক নূতন রাজ্যে—যেন সে আর্য্যপুত্রের হস্ত ধরিয়া দক্ষিণারণ্যপথে প্রবেশ করিতেছে, স্নেহময় পতি শুকতার আতপত্র মাথার উপর ধরিয়া আছেন; সীতার চক্ষু আবেশে মুদিতপ্রায়—এমন সময়ে গোদাবরী তট হইতে সৈকতলীন হংসশ্রেণী ডাকিয়া উঠিল, সীতার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, তন্ময়তা কোথায় বিলীন হইল—এ কি, এ যে চিত্র?

সীতা কোমলপ্রকৃতি, ভীরু-স্বভাবা এবং রামময়-জীবন্তা; চিত্রে শূর্পণখার ছবি দেখিয়া ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তা—চীৎকার করিয়া রামের অঙ্গে ঢলিয়া পড়ে। রাম বুঝাইয়া দেন "অয়ি বিরহভীতে, এ যে চিত্র"। চিত্র দেখিয়াই যার এ ভয়, নির্জ্জন অরণ্যে একাকিনী সে নির্ব্বাসিতা হইবে? বিরহভয়েই যে কাঁপিয়া উঠে, তাহাকে চিরবিরহ সহ্য করিতে হইবে? হৃদয়ক্ষেত্র ঠিক প্রস্তুত না হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। চিত্রদর্শন দ্বারা মহাকবি, পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইলেন; নতুবা সরসরসও যে শুকাইয়া উঠিবে, সমস্ত পরিশ্রমই যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

রামচন্দ্রের চরিত্রই অদ্ভুত—একদিকে উন্নতশির সুমেরু, অন্যদিকে নতমুখ কেতকী-তরু। লক্ষ্মণ "অয়ং ভার্গবঃ" এই ভার্গব বলিয়া যেমন নামোল্লেখ করিবে—অমনই বিনয়াভিরাম রাম আপনার বিজয়-গর্ব্বে কুণ্ঠিতই হইয়া পড়িলেন; যেন ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণ ঋষির নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই করিলেন।

লক্ষ্মণ সীতার বিস্ফারিত নয়নের প্রতি চাহিয়া যেমনই যুদ্ধটি বর্ণনা করিতে যাইবেন—রাম অমনই অসহিষ্ণু হইয়া "অনেক দেখাইবার আছে, তাহা দেখাও" বলিয়া লক্ষ্মণকে নিষেধ করিলেন।

পরাজিত শত্রুর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ মহত্ত্বের কার্য্য বলিয়া অনেকে করেন, কিন্তু প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রশংসা শুনিতে হইবে বলিয়া এমত কুণ্ঠা—আপনাকে এমত অপরাধী ভাবা, সে এক রামেরই সাজে। প্রচ্ছন্ন অহমিকা চিত্ত হইতে দূর করিতে পারাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

সম্মুখে আর একটী চিত্র সীতাকে আকর্ষণ করিল। ইক্ষ্বাকু রাজারা প্রাচীন বয়সে যে আরণ্যকব্রত গ্রহণ করিতেন—রামচন্দ্র নবীন যৌবনে আজ সেই ব্রত গ্রহণ করিতেছেন। এ গৌরবে, এ গর্ব্বে সীতার নারীহৃদয়

ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল; চক্ষু দুটি ভালবাসার আবেশে ঢল ঢল ছল ছল হইয়া কম্পিত নীলপদ্ম-মালার আকার ধারণ করিল। ইহা সত্যের জন্য রাজ্যত্যাগ, সর্ব্বত্যাগ ও আত্মত্যাগ—তাই রাম অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া প্রসন্নপুণ্যসলিলা রঘুকুলদেবতা ভাগীরথীর কথা আনিয়া ফেলিলেন; "সীতায়াং শিবানুধ্যানপরা ভব" বলিয়া সীতার শুভাশুভের ভাব ভাগীরথী-দেবীর উপর অর্পণ করিলেন। এই উক্তির জন্যই ভাগীরথীদেবী সীতাকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে তাহার পুত্রদ্বয়কে স্তন্যত্যাগের পর বাল্মীকি আশ্রমে রাখিয়া আসেন।

লক্ষ্মণ দেখাইল—"এই আর্য্যা সীতা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি"; উর্ম্মিলার নাম করিল না দেখিয়া সীতা হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মণকে কহিল—"বৎস এই অপরটি কে?" দেবর ভাজের এই সরস রসিকতাটি বড়ই মিষ্ট, বড়ই উপভোগ্য। দেখা গেল, সীতাই মধুর রসিকতা করিত, লক্ষ্মণ কিন্তু তাহার উত্তর দিত না; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী আর্য্যা, পূজ্যা ও মাতৃতুল্যা বলিয়া লক্ষ্মণ সীতার সহিত রসিকতা করিত না। যে কখন সীতার মুখের পানে চাহিয়া দেখে নাই, সে রসিকতা করিবে কি? লজ্জার হাসি হাসিয়া—"অয়ে উর্ম্মিলাং পৃচ্ছতি আর্য্যা" বলিয়া লজ্জার হাসি হাসিল মাত্র। ইহাতে কেহ বুঝিবেন না যে—লক্ষ্মণ নিরীহ ও গোবেচারী কিম্বা অরসিক যোদ্ধা-মাত্রই ছিল। এ বিষয়ে একটি পুরাণ গল্প আছে, তাহা রামায়ণের না হইলেও প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইল—

জনকালয়ে সীতার সখীরা প্রথম রামকে প্রশ্ন করিল, "বল দেখি, তুমি কার কন্যা বিয়ে করেছ?" "কেন, জনকের কন্যা"—সখীরা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া উচ্চ হাসি হাসিল। কোন-সুরসিকা সখী শুনাইয়া দিল—"অজ-বংশে ওরকম হয়।" জয়গর্ব্বে উল্লসিত সখীরা লক্ষ্মণের নিকটেই মুখের

মত উত্তর পাইল "কেন, তোমাদের জনকের কন্যা"—কাহারও মুখ লজ্জায় নত, অপমানে মলিন, ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। জনকের কন্যা সহোদরা—তোমাদের জনকের কন্যা কে—সকলে বুঝিয়া লউন। অথচ তোমাদের জনক—জনক রাজাত উহাদেরই; ইহাতে দোষের কথা কিছু নাই।

সংসারে নানা দুঃখ শোক, দৈন্য অভাব, অবজ্ঞা ও প্রতারণার মধ্যে আসিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন—সেদিন চলিয়া গিয়াছে। অতীত চিরদিনই মধুর, বর্ত্তমান চিরদিনই দীন। রামচন্দ্র কিন্তু অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া সীতাকে শান্ত করিয়া এমন সুখের মুহূর্ত্তে বলিলেন—"তে হি নো দিবসা গতাঃ"। তরুণ-বয়সের সেই আধ অনুরাগ, আধ লজ্জা, সেই ধরি ধরি ভালবাসার খেলা বস্তুতই উপভোগ্য বোধ হইবারই কথা। সুখের চেয়ে সুখের স্মৃতি মধুর। যৌবনের উন্মুক্ত মুখ-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা কৈশোরের অর্দ্ধমুক্ত মুখচ্ছবি অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

কালিন্দীতটে "শ্যাম" নামক বটবৃক্ষ—সেই বৃক্ষতলে রামের উৎসঙ্গ আশ্রয় করিয়া সীতার দেহলতিকা অবসন্নভাবে শায়িতা; নির্জ্জনে আলিঙ্গনচ্ছলে ক্লান্তিনাশক সেই মৃদু মৃদু সংবাহন, সীতা সেই স্মৃতিসুখ অনুভব করিবার জন্য চক্ষু মুদিল। ঐ "মেঘমেদুরিতনীলিম" প্রস্রবণ গিরি—তথায় "অবিদিত-গত-যামা", কত রাত্রি পোহাইয়াছে। পরস্পরের বাহু পরস্পরের অঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছে, ক্রমশূন্য রলাপাপের মুক্তবেণী-ধারা উচ্ছ্বাস-তরঙ্গিত হৃদয়ের মধ্যস্থল দিয়া বহিয়া যাইতেছে। যে তন্ময়তায় রাজধানী ও বনারণ্যের ব্যবধান নাই, বৈতালিক বাদ্য ও সিংহব্যাঘ্রাদি গর্জ্জনের প্রভেদ নাই,—সেই তন্ময়তাই প্রেমের সুখ ও সর্ব্বস্ব। রাম সীতার মিলনে সেই তন্ময়তা ছিলখ উৎকৃষ্ট অভিনয়ের গুণই এই, অভিনয়কে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় না, বাস্তব বলিয়াই বোধ হয়।

চিত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সীতা শূর্পনখার চিত্র দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল—"হা আর্য্য-পুত্র, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ শেষ হইল।" এ যে চিত্র—সীতার মনে নাই। ভাবনা-প্রকর্ষে স্মৃতি অনুভূতির আকার ধারণ করে—ইহা দর্শনের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। রাম আশ্বস্ত করিলেন—"অয়ি বিরহ-ভীতে, চিত্রমেতৎ"—এ যে চিত্র।"

মিলন-রাজ্য শেষ হইয়া এইবার বিরহরাজ্যের সীমানায় আসা গেল। সীতা-বিরহে বিকলেন্দ্রিয়, রাম কি প্রকারে বনে বনে উন্মত্তের মত ভ্রমণ করিতেছেন, পাষাণবিদ্রাবী ক্রন্দনে কি ভাবে তিনি বনের পশু পক্ষীগুলিকে পর্য্যন্ত কাঁদাইতেছেন, পদ্মপলাশনেত্র হইতে অশ্রুধারা মুক্তামালার মত কি ভাবে টপ্ টপ্ করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে—সীতা সাশ্রুনয়নে আর্য্যপুত্রের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এত প্রেম, অভাগীর বিরহে রঘুনাথের এত ব্যথা!

তখন রামের হৃদয়ে অতীত দুঃখের সংস্কারগুলি দুঃখরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে; রামের হৃদয়ও বেদনার ভারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ সুখের সময়ে অতীতদুঃখের স্মৃতি বেদনা দেয়, ইহাই কবির মত। রাম বলিলেন—"বিরহাগ্নি তীব্র হইলেও প্রতীকার আশায় সহ্য করা গিয়াছে; এখন চিত্র দর্শনে উহা দ্বিগুণ প্রজ্জলিত হইয়া মর্ম্মস্থ ব্রণের মত আমাকে ব্যথা দিতেছে।"

কালিদাস রঘুবংশে চিত্র-দর্শন বিষয়টী অবতারণা করিয়াই বলিয়াছেন —সুখের সময় দুঃখের স্মৃতি সুখকরই হইয়া থাকে। "প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্"। "কিং-নামধেয়" পর্ব্বতের ঐ কুঞ্জ —ওইখানে রোরুদ্যমান রামচন্দ্র লক্ষ্মণের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান! সীতা বাষ্পাকুল নয়নে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; আপনার মন দিয়া রামের মনটি বুঝিয়া লইল। ঐ মাল্যবান্ পর্ব্বত! না—ঐ দূরে

আর দেখা যায় না—"বৎস বিরত হও, আর আমি এ দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না" ; রাম চিত্র-দর্শন বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। এইবার যুদ্ধ—রাক্ষসবানরের শ্রবণবিদারী কোলাহল। অস্ত্রের ঝঞ্চনা, আর শত শত বীরের ভূমিতলে চিরশয়ন। এ দেখার সহিত মিলন ও বিরহের তত সম্বন্ধ নাই ; সীতার বিশেষ তৃপ্তিও নাই। সীতা নির্ব্বাসনের অনভূতির সহিত ইহা বিজড়িতও নহে।

রামের এ কষ্ট দেখিয়া সীতার প্রাণ যদিও কাতর, চক্ষু অশ্রুময় হইয়াছিল, তথাপি ইহাতে আদর্শ পতিব্রতার একটি সৌভাগ্যগর্ব্ব ও ভালবাসার আত্মপ্রসাদ ছিল। সমবেদনার বালুকাচরে আত্মতৃপ্তির ফল্গুস্রোত নীরবে বহমান ছিল। করুণরসের নাটক দর্শনে দুঃখ হয় তথাপি সহৃদয় রসজ্ঞ জন তাহা দর্শন করিতে ইচ্ছুক। দুঃখের মধ্যেও আনন্দময় রসের অনুভূতি নিয়তই বিদ্যমান থাকে। সীতা আপনার দুঃখ সামান্য বলিয়া বুঝিল, রাবণগৃহে অশোক-বনে সেই যন্ত্রণাপ্রাপ্তি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিল। তখন সীতার ইচ্ছা—চিরপরিচিত বনস্থলী আবার দেখে, ঋষিপত্নীদের সঙ্গে আবার মেলামেশা করে ; ওই সঙ্গে, পূর্ব্ব-স্মৃতি-চিহ্নগুলিও একবার দেখিয়া আইসে। রামচন্দ্র গর্ভাবস্থার উপযোগী অস্খলিত রথ প্রস্তুতের আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ সে আদেশ পালনের জন্য চলিয়া গেল। দশ মাস গর্ভাবস্থায় রথারোহণ অনুচিত—তাই কবি রথের "অস্খলিত" বিশেষণ দিয়া সেই অনুচিতটি পরিহার করিয়াছেন। শ্রান্তা জানকী অলস দেহভার আর বহিতে পারে না ; রামের বিস্তৃত বক্ষে স্বেদসিক্ত শিথিল বাহু দুইটি নিক্ষেপ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রামের বাহু-উপাধানে এ জন্মের মত সীতার আজ শেষ নিদ্রা ! রাম ঘুমন্ত মুখখানির পানে চাহিয়া চাহিয়া নিজের সৌভাগ্যের কথাই ভাবিতেছিলেন ; এমন সময়ে মূর্ত্তিমান্ অভিশাপের

মত দুর্ম্মুখ আসিয়া উপস্থিত হইল। "সীতার বিরহ ব্যতীত সকলই সুন্দর" রাম এই কথা যেমন বলিলেন—অমনই বিরহই যেন সম্মুখে দাঁড়াইল।

তীব্র-সংবেগ বাগ্বজ্র নিক্ষেপ করিয়া দুর্ম্মুখ আপনার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গেল। অমঙ্গল ছায়া পশ্চাতে রাখিয়া ধূমকেতুর মত সে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রামের সুখ শান্তির আজ অবসান। নিষ্কলঙ্কা সীতার চরিত্রে যাহারা এত বড় কুৎসিত নিন্দা উদ্গার করিল, রাজার প্রেমরাজ্য-প্রতিষ্ঠা জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিল—সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজারা সাধারণ রাজার বিচারে দণ্ডার্হই বিবেচিত হইত; কিন্তু লোকরঞ্জনই যাঁহার ব্রত—সেই আদর্শ রাজা তজ্জন্য প্রজাদিগকে দোষী করিলেন না—বরং বলিলেন—

"যচ্চাদ্ভূতং কর্ম্ম বিশুদ্ধিকালে
প্রত্যেতু কস্তদ্দূরবৃত্তং ॥"

লঙ্কায় অগ্নিশুদ্ধি—অযোধ্যার প্রজাদের তাহা বিশ্বাস না করিবারই কথা। লক্ষ্মণের মুখে "যাবদার্য্যায়া হুতাশনে বিশুদ্ধিঃ"—শুনিয়া যে রাম বড় গলায় বলিয়াছিলেন—"উৎপত্তি-পরিপূতা সীতার আবার শুদ্ধি কি?"—আর আজ সেই রাম নিজেই "বিশুদ্ধি কালে" কথাটি ব্যবহার করিলেন। লক্ষ্মণকে যাহা বলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের বাণী, মনের বিশ্বাস। দুর্ম্মুখকে যাহা বলিলেন, তাহা প্রজার প্রতিনিধি রাজার কথা। ইহা লোকমতের প্রতিধ্বনি মাত্র। যখন তিনি সীতার পতি, তখন তিনি "বিশুদ্ধি" কথাটি শুনিতে চাহেন নাই; আর এখন তিনি নরপতি, নিজের ধারণা যাহাই হউক না—তাহা যখন লোকমতের বিরুদ্ধ, তখন প্রজার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বলতা দেখাইবেন কেন? রাজাই রাজ্যের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম ও আচারের রক্ষক। তাঁহাকে প্রজাসাধারণের দৃষ্টি লইয়া সাক্ষ্যাধীন বিচারকের মত

বিচার করিতে হইবে। রামচন্দ্র তখন আদর্শ রাজার মত সীতার বর্জ্জনই উচিত বিবেচনা করিলেন।

গৃহের শোভা, বক্ষোপরি নিদ্রিতা, "আতঙ্ক-স্ফুরিত-গর্ভভারা" সীতাকে আজ চিরদিনের মত ত্যাগ করিতে হইবে, জনকনন্দিনী প্রিয়তমাকে সিংহ ব্যাঘ্রাদির বলিরূপে গভীর ঘনারণ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে—উঃ কি ভীষণ রাজকর্ত্তব্য-পালন! রাম আজি যদি ইক্ষ্বাকুবংশধর না হইতেন, রাজার আসনে না বসিতেন, তাহা হইলে নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে হয়ত এ কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইত না। সীতাচরিত্রে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিলে এ কার্য্য হয়ত তত কষ্টকরও হইত না। রামায়ণে সীতা বিসর্জ্জন ব্যাপারে রাম ভ্রাতাদের লইয়া একটি বিচার করেন। ভবভূতির রামচন্দ্র সে বিচার করা বোধ হয় ভাল বুঝিলেন না। ঐ সাংঘাতিক সময়ে বিচার করার মত চিত্তের অবস্থা তাঁহার ছিল না, থাকিলে মানাইতও না। রাম একেবারেই সীতা-বিসর্জ্জনে আজ্ঞা দিলেন; এমন কর্ম্ম ইক্ষ্বাকুবংশে কাহাকেও করিতে হয় নাই বলিয়া আপনাকে নূতন রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়া ধিক্কৃতও করিলেন। সীতা নির্ব্বাসন অপূর্ব্ব কর্ম্মই বটে। এমন ভালবাসার পত্নীকে, এমন স্বতঃশুদ্ধা জানকীকে পূর্ণ-গর্ভাবস্থায় বনবাস দেওয়াকে আমরা লোকারাধনারূপ ব্রতপালনই বলি। রাম ব্যতীত এ কার্য্য কেহ করেন নাই, করিতে পারিতেনও না।

রাজাদিগের চরই চক্ষু। দুর্ম্মুখ স্বকার্য্যই করিয়াছে—তজ্জন্য সে আদর্শ রাজার নিকট অনুযোগার্হ হয় নাই, বরং অন্য গুরুতর কর্ম্মভার পাইয়া, উপযুক্ত চরের যোগ্য আদরই পাইয়াছে। দুর্ম্মুখের এ কর্ত্তব্য পালন, রামের কর্ণে সীতার কলঙ্ক উদ্ঘোষণারূপ দুর্ভাগ্য তাহার ছিল—তজ্জন্যই তাহার নাম দুর্ম্মুখ।

রাম তখন বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন, সুপ্তা সীতার পদযুগল মাথায় লইয়া সীতার প্রতি গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

"অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসি পাদ-পঙ্কজস্পর্শ" আমার মাথায় তোমার পাদপদ্ম অর্পণ আজ শেষ হইল।

রাম যে মধ্যে মধ্যে সীতার পদ মাথায় লইতেন, তাহা নহে। পবিত্রা সীতার পাদপদ্ম মাথায় লওয়ার যোগ্য,ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল মাত্র। স্বতঃ-পূতা সীতার নিকট তিনি কত ক্ষুদ্র—কত উচ্চাসনে তাহাকে বসাইয়া তিনি পরিতৃপ্ত—এই ভাবই তাঁহার বদ্ধমূল। রাম যে এতদিন সীতাকে হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ভাবিয়া আসিয়াছেন—ইহা মিলনের শেষ যামার্দ্ধে না জানাইলে জানাইবার আর অবসর মিলিবে না। পত্নী ধর্ম্মতঃ দাসী, তিনি পতি, ধর্ম্মতঃ প্রভু; কেমন করিয়া লোক-সমক্ষে তাহার পদস্পর্শ করিবেন? আর সীতাই বা তাহা করিতে দিবে কেন? সীতা গভীর নিদ্রামগ্না, চিরদিনের মত নির্ব্বাসিতা হইতে চলিয়াছে, আজ আর লজ্জা সঙ্কোচই বা কি? অন্তরের প্রতিচ্ছবিই বাহিরে প্রকাশ পাইল, জীবনের ধারণাই কার্য্যাকারে ফুটিয়া উঠিল। সীতার প্রতি অপরাধেরই আজ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

এইরূপ মনের অবস্থা—এমন সময়ে লবণ দৈত্যের দ্বারা উৎপীড়িত ঋষিগণ "অব্রহ্মণ্য অব্রহ্মণ্য" বলিয়া সাহায্যার্থী হইয়া আসিলেন। প্রজার প্রতিনিধি, দেশের শান্তিরক্ষক নরপতি—অমনই নিজের দুঃখবেদনা ভুলিয়া গেলেন, কঠোর কর্ত্তব্যে বুক বাঁধিয়া তাঁহার দমনার্থ শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তখনই একবারমাত্র ফিরিয়া আসিয়া সীতার ঘুমন্ত মুখখানির পানে চাহিয়া—"ভগবতি বসুন্ধরে, তোমার শ্লাঘনীয়া দুহিতাকে দেখিও" বলিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

দুঃস্বপ্ন-বিপ্রলব্ধা সীতা জাগিয়া উঠিয়া শুনিল—বনবাসের জন্য রথ

প্রস্তুত। সীতা জানিত, বনগমনে রাম সঙ্গী হইবেন—তাই সে মনের আনন্দে ছুটিয়া গেল—হরিণী বংশীধ্বনি শুনিয়া মরণের পথে যাত্রা করিল। জন্মের মত সীতা নির্ব্বাসিতা হইতেছে, অযোধ্যায় ইহা জানান অবশ্য নিরাপদ নহে। এ বিষয়ে বাল্মীকি ও ভবভূতি একই পন্থা অবলম্বন করিলেন। নমো তপোধনেভ্যঃ, নমো গুরুজনেভ্যঃ, নমো আর্য্যপুত্র-চরণ কমলেভ্যঃ" বলিয়া সীতা যবনিকা অন্তরালে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথমেই বিষ্কম্ভক *। বনদেবী বাসন্তী ও অধ্বগবেশা আত্রেয়ীর কথোপকথন। বাসন্তী সীতার প্রাণপ্রিয়া সখী ও পঞ্চবটী-বাসের বিশ্রম্ভ সাক্ষী। আত্রেয়ী পুরাণ-ব্রহ্মবাদী বাল্মীকির শিষ্যা ও ব্রহ্মচারিণী নারী। বাসন্তী সত্ত্বরজোগুণময়ী, রসময়ী প্রবৃত্তি। আত্রেয়ী সত্ত্বগুণময়ী, শান্তিময়ী নিবৃত্তি। বাসন্তী প্রকৃতিরাণীর জীবন্ত প্রতিমা। আত্রেয়ী আশ্রমবিদ্যার সঞ্চারিণী আকৃতি। একটি—রূপে ও গুণে রাজ্ঞী। অন্যটি—সাধনা তপস্যায় সন্ন্যাসিনী।

আত্রেয়ী যেন নদী; বনদেবী বাসন্তীর স্নেহময় বক্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। এ মিলন বড়ই সুন্দর, বড়ই উপভোগ্য। আত্রেয়ী কুলুকুলু স্বরে কহিয়া গেল—বাল্মীকি আশ্রমের কথা, যমজ-শিশু কুশীলবের কাহিনী। শিশুদের ঈষদারক্ত কৃষ্ণনয়ন, আরক্তিম ওষ্ঠাধর, মৃণালশুভ্র ললাট ও ভ্রমরচিকণ

---

* বৃত্তবর্ত্তিষ্যমানানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ। সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভঃ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ।

কাকপক্ষ ধীরে ধীরে মানস চক্ষুর উপর ফুটিয়া উঠিল ; তাহাদের আজন্ম-সিদ্ধ জন্তুকাস্ত্রের চিত্রটি প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিল। মহর্ষি রামায়ণ প্রণয়নে এবং শিশুদের স্বর-শিক্ষা ও বিদ্যাদানে এমতই ব্যস্ত যে, তাঁহাতে আত্রেয়ীর পাঠের সুবিধা হইতেছে না। বিশেষতঃ প্রদীপ্তপ্রজ্ঞ কুশলবের সহিত তাহার সহাধ্যয়ন-যোগ থাকিতেছে না, ফলে ইহাতে তাহার লজ্জা ও সঙ্কোচই জন্মিতেছে। তাই সে বাল্মীকি-আশ্রম ত্যাগ করিয়া, কত গিরিনদী পার হইয়া, দাক্ষিণাত্যে—অগস্ত্যাশ্রমের অভিমুখে যাইতেছে ; পথের মধ্যে বাসন্তীর সহিত সাক্ষাৎ।

আত্রেয়ীকে পথশ্রমে ও রৌদ্রতাপে ক্লান্তা দেখিয়া বনদেবী ফলকুসুমার্ঘ দ্বারা তাহার তৃপ্তি বিধান করিল। "এই বন, যথেচ্ছ ভোগ করুন ; আজ আমার সুদিবস" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিল। তরুচ্ছায়া—আসন, স্বচ্ছ বারি—পাদ্য, ফলমূল—ভোজ্য, মধুর বাণী—ভোজন-দক্ষিণা হইল। বনদেবীর আতিথেয়তা ও নম্র ব্যবহার পরিশ্রান্তা আত্রেয়ীর নিকট ফলমূল অপেক্ষাও উপাদেয় প্রতীত হইল। বাসন্তী দাক্ষিণাত্যের মহিমময়ী রাজ্ঞী, বনদেবীরূপেই আখ্যাতা ; বস্তুতই সে দেবী। স্নেহে গোমুখী, মাধুর্য্যে অপরাজিতা, সরমে বনযূথিকা ও আতিথেয়তায় ফলভরাবনতা আম্রশাখা।

এই আলাপে জানা গেল—যমজ শিশু দুইটী সীতার তনয় ; তাহাদের নাম কুশলব। বাল্মীকির নিকট তাহারা শিষ্য এবং ছাত্ররূপে বিদ্যা এবং অস্ত্র শিক্ষা করিতেছে। আরও জানা গেল, সীতাপতি রামচন্দ্র সীতারই হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে সহধর্ম্ম-চারিণীরূপে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন। ধূমপায়ী শূদ্র আজ কঠোর তপস্যারত, তাহারই ফলে ব্রাহ্মণ-শিশুর অকাল মৃত্যু, আর এইজন্যই শম্বুকপাণি রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে আসিতেছেন—এই সকল তথ্য জানাইয়া আত্রেয়ী স্বস্থানে চলিয়া গেল।

শূদ্র শম্বূক তপস্যারত। সম্মুখে শস্ত্রপাণি রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের উদার প্রাণ এবং সুপরিশুদ্ধ বিবেক বলিতেছে—এ দণ্ড নহে, হত্যা। বধার্থ তরবারি উঠিতে চাহে না। রাম তখন বলিতেছেন—

"রে দক্ষিণ হস্ত, মৃত ব্রাহ্মণ-শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি শূদ্রক মুনির উপর অস্ত্র ক্ষেপ কর! তুমি রামের অঙ্গ, দুর্ব্বহগর্ভ-খিন্না সীতার নির্ব্বাসনে পটু তুমি—তোমার আবার করুণা কি"?

প্রাণ এবং বিবেক যাহাই বলুক; তিনি যে আজ দেশের প্রতিনিধি দেশের শাস্ত্র ও আচারের রক্ষক, আইন অনুযায়ী প্রজার দণ্ডবিধাতা। শাস্ত্র ও দেশাচার যাহা বলে, দৈববাণি যাহা আদেশ করে, তাহার বিরুদ্ধে চলিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। নিজের বিবেক, নিজের ধারণা বা নিজের দুর্ব্বলতার দিক্ দিয়া বিচার করিতে তিনি পারেন না। সীতা বিসর্জ্জনের মত এ কার্য্যেও তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। রামচন্দ্র আজ দেশের রাজা না হইলে হয়ত তাঁহাকে এ কার্য্য করিতে হইত না। কি সীতা বর্জ্জন, কি শম্বূক বধ—একই বৃত্তির কার্য্য; দুইটাই প্রজানুরঞ্জনের পরাকাষ্ঠা।

খড়্গ প্রহারের পর গভীর মর্ম্মবেদনায় রাম বলিয়া উঠিলেন—

"কৃতং রামসদৃশং কর্ম্ম; অপি জীবেৎ স ব্রাহ্মণ শিশু"! রামের সদৃশ কর্ম্ম করা হইল, এক্ষণে ব্রাহ্মণশিশু বাঁচিবে ত?

এ অস্ত্রাঘাত কেবল শম্বূকের উপরই পড়িল, তাহা নহে, রাম নিজ দেহেও এ ব্যথা অনুভব করিলেন। দৈববাণি না হইলে রামচন্দ্র কখনই এ কার্য্য করিতেন না—এইটি বুঝিয়া বিচার করিলে রামচন্দ্রকে দোষী বলা চলে না; দৈববাণির উপর তাঁহার বিশ্বাসও অটুট। তথাপি এ নৃশংস কার্য্যের ফল যে শুভ—ইহা বিশ্বাস করিতে যেন তাঁহার উদার প্রাণ প্রস্তুত নহে।

যাজ্ঞিকের পশুবলির মতই এই শম্বূক-বলি। জন্মান্তরীণ ও ইহকৃত কর্ম্মফল শেষ করিয়া শম্বূক দিব্যদেহ লাভ করিল; তাহার পার্থিববাসনা তপনোদয়ে কুয়াসার মত মিলাইয়া গেল। শূদ্রক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া ব্রাহ্মণ-শিশুর জীবন-প্রাপ্তির সংবাদ দিল ও নিজের দিব্যদেহ এবং দিব্যধাম লাভের কথাও জানাইয়া গেল।

"সঞ্জীবিতঃ শিশুরয়ং মমচেয়মৃদ্ধিঃ"

শম্বূকের এই আনন্দময় বৈরাজ-লোক-প্রাপ্তি না ঘটিলে হয়ত অনেকের মনে রামচন্দ্রের উপর একটি ক্ষোভ থাকিয়া যাইত। শূদ্রকের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অতীব প্রবল, নচেৎ রাজদণ্ড উপেক্ষা করিয়াও সে কঠোর তপস্যা করিবে কেন? শাস্ত্র এবং আচার-বিরুদ্ধ হইলেও তাহার ধর্ম্মানুরাগ অতুলনীয়। নতুবা রামচন্দ্রের আগমন এবং বৈরাজ প্রাপ্তিই বা তাহার ঘটিবে কেন?

উত্তররাম-চরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক ভবভূতির অপূর্ব্ব রচনা। বীর, রৌদ্র, বীভৎস, বিস্ময় ও ভয়ানক রসে যে তাঁহার কি অসাধারণ শক্তি, তাহার পরিচয় ইহাতে পরিস্ফুট। সমালোচক বলিয়াছেন "উৎকটে ভবভূতি"।

এই অঙ্কের প্রকৃতি-বর্ণনার সহিত রামচন্দ্রের মনোবৃত্তি যেন এক সুরে বাঁধা। বাহ্যপ্রকৃতি ও রামের অন্তঃপ্রকৃতি যেন দুইই বিম্ব ও প্রতিবিম্ব, যেন দুইটাই এক। রামচন্দ্রের মনোবৃত্তির বীণায় যখন যে সুর বাজিয়াছে, বহিঃ-প্রকৃতির যন্ত্রেও সেই সুরের প্রতিরণন শুনা গিয়াছে; রামের চিত্তে যখন যে রাগিণী বাজা আবশ্যক হইয়াছে, বাহ্য-প্রকৃতিতেও ঠিক সেই রাগিণীর তান ফুটিয়াছে।

রামের মনোবৃত্তিই বাহ্যপ্রকৃতির আকারে প্রতিভাসিত, কিম্বা বাহ্য প্রকৃতিই রামের মনোবৃত্তির রাগে অনুরঞ্জিত। রামের প্রকৃতিই বহিঃ-প্রকৃতিরূপে, ইহা সূক্ষ্ম-চিন্তা। বহিঃপ্রকৃতি আর রামের মনোবৃত্তি

এক-ভাবাপন্ন বা পরস্পর বিম্বপ্রতিবিম্ব—ইহা সাধারণ চিন্তা। রামের মনোবৃত্তির চিত্র আর গিরিনদী-বনময়ী প্রকৃতির চিত্র, সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে—উভয়ের একই সুর, একই ঝঙ্কার, একই অর্থ ও একই উদ্দেশ্য।

স্নিগ্ধ-শ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণা ভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাং।
এতে তীর্থাশ্রম-গিরিসরিদ্গর্ত্ত-কান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্য-ভাগাঃ।

দণ্ডকারণ্যের একভাগ স্নিগ্ধশ্যাম, অপরভাগ ভীষণ-বিস্তার ও রুক্ষ। স্থানে স্থানে, নির্ঝরের ঝঙ্কৃত রবে দিক্ সকল মুখরিত। কোথাও তীর্থক্ষেত্র, আশ্রম, কোথাও গিরিনদী, কোথাও বা গর্ত্ত ও কান্তার অবস্থিত।

রামের হৃদয়ের পানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—একভাগ কি স্নিগ্ধ, কি নয়নরঞ্জন! অপর ভাগ কি ভীষণ-বিস্তার, কি রুক্ষ। কি নয়নরঞ্জন, কোমল অথচ কঠোর মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য! রামের হৃদয় স্বভাবতঃ শীতল ও রমণীয় ছিল, কিন্তু এখন স্বহস্তকৃত সীতা নির্ব্বাসন-জন্য বেদনায় সে হৃদয় মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে। চারিদিকে তপ্ত বালুকারাশি ছুটিতেছে; জল নাই, তৃণ নাই—উঃ সে কি ভীষণ, কি কর্কশ! মর্ম্মন্তুদ যাতনা সহিয়া সহিয়া তাঁহার কোমল বক্ষ ক্ষতবিক্ষত, প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়াছে। পুণ্যতীর্থের পবিত্রতা, আশ্রমের শান্তি, উত্তুঙ্গ শৈলশিখরের উচ্চতা বিরাজমান; স্বচ্ছ তোয়া তটিনী কুলুকুলু নিনাদিতা। আবার গভীর ক্ষতের মত বিশালমুখ গর্ত্তগুলি—হাঁ করিয়াই আছে, কান্তারের অত দুঃখগুলি অসাড় ভাবে পড়িয়া আছে।

দণ্ডকারণ্য অভিশপ্ত ভূভাগ অথচ জনস্থানও বটে। রামের হৃদয়ও

নির্ব্বাসনতাপে অভিশপ্তবৎ, সংযমে ও পবিত্রতায় আশ্রমবৎ। দণ্ডকারণ্যের একদিকে সর্ব্বভূতলোমহর্ষণ উন্মত্ত শ্বাপদকুলের শ্রবণ-বিদারী গর্জ্জনে গিরিগহ্বর কি ভীতিকর! আবার এইরূপ গিরিগহ্বর সমেত দীর্ঘ অরণ্যানী যেন স্বতন্ত্র পৃথিবীর মতই দক্ষিণ দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত। রামের হৃদয়েও উন্মত্ত শোকের কি প্রচণ্ড কোলাহল, কি ভয়ানক হাহাকার ধ্বনি! ঐ কোলাহল ও হাহাকারে পূর্ণ অতলস্পর্শ দুঃখ-গহ্বরও রামের দেহ, ইন্দ্রিয় ও চিত্তের মধ্যেই নিয়ত বিরাজিত।

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনা
স্বেচ্ছাসুপ্ত-গভীরঘোষ-ভুজগশ্বাস-প্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎ স্বল্পাম্ভসো যা স্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগর-স্বেদদ্রবঃ পীয়তে॥

দণ্ডকারণ্যের একস্থান পক্ষিকূজনরহিত ও স্তিমিত; অপরস্থান বন্যজন্তুর কোলাহলে মুখর ও ভীষণ। রামেরও বামপার্শ্ব নিঃশব্দ মৌন, দক্ষিণপার্শ্ব হাহাকারময়। স্বচ্ছন্দসুপ্ত, বিস্তৃতফণা সর্পকুলের নিশ্বাস বায়ুর ফুৎকারে দাবাগ্নি হু হু করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। রামের অন্তরে মন্দীভূত বিরহাগ্নিও প্রিয়-স্মৃতিচিহ্ন-দর্শনে দ্বিগুণভাবেই জ্বলিয়া উঠিতেছে। আলবালের একপ্রান্তে অল্পমাত্র বারি চিক্ চিক্ করিয়া শোভা পাইতেছে। সেইস্থানে তৃষ্ণাতুর কৃকলাসগুলি স্বচ্ছন্দাবস্থিত অজগরের দেহনিঃস্যন্দ স্বেদজল পান করিয়াই আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া লইতেছে। রামেরও মর্ম্মদেশে কর্ত্তব্যপালন-ধর্ম্ম ও প্রজারঞ্জন-ব্রতের স্বচ্ছ জলধারা মৃদু মৃদু বহিতেছে; অন্তঃস্থ শোকতাপের কৃকলাসগুলি বাহিরে আসিয়া দেহ নির্গত স্বেদবারি মুহূর্ত্তেই শুষিয়া লইতেছে।

সেই জনস্থান, সেই চিরপরিচিত ভূতপূর্ব্ব ধরালয় জনস্থান!

অশ্রুপাতনোদ্গমনের অন্তরালে রাম কোনরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বানুভূত অতীত ব্যাপারগুলি প্রত্যক্ষের মত তখন তাঁহার চিত্তে ভাসিয়া উঠিল। স্মৃতি অনুভবের আকারে দেখা দিল। বৈদেহীর বড় প্রিয়, সেই সেই বনস্থলী—রামের কাছে আজ দুঃখময়ী বলিয়া বোধ হইল! মধুস্যন্দী উপবনের শ্যামল যৌবনশ্রী আজ রাক্ষসীমূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে আসিল। সুখের সময়ে যাহার শোভায় শ্রান্তদেহ স্নিগ্ধ, ক্ষুব্ধ ইন্দ্রিয় তৃপ্ত, উত্যক্ত প্রাণ হৃষ্ট হইত, আজ দুঃখের সময়ে সেই শোভাই দেহকে বিকল, ইন্দ্রিয়কে বিভ্রান্ত প্রাণকে তিক্ত করিয়া তুলিল। সেই কুসুম-সুরভি প্রমোদবন, সেই ঘনবিন্যস্ত তরুশ্রেণী, সেই হংসমালা-মুখর নদীতীর রামকে এক অজ্ঞেয় মোহে আচ্ছন্ন করিল। সেই বিশ্রম্ভ-সাক্ষী শয়নীয় শিলাতল, সেই সীতা-সংবর্দ্ধিত ময়ূরশাবক, সেই সন্তানপ্রতিম করিপোত ও সেই মাতৃহারা মৃগশিশু রামের দেহেন্দ্রিয়কে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। রামের তখন মনে পড়িতে লাগিল, সীতাসহ সেই সুখভ্রমণ, সীতাসহ সেই বিশ্রম্ভ আলাপ, সীতাসহ সেই "অবিদিত গতযামা" রাত্রি অতিবাহন!

সেই প্রিয়স্মৃতিচিহ্ন এখন এত দুঃখপ্রদ—হায়, তাহা দেখার আর আবশ্যক নাই। তাই শম্বুক "তদলমেভির্ঘোরসত্ত্বৈঃ" এ দুর্দ্ধর্ষ স্থান দেখার প্রয়োজন নাই বলিয়া প্রশান্ত-গম্ভীর মধ্যমারণ্যের কথা পাড়িল। যার প্রান্তভাগ, মদমত্ত ময়ূরের কণ্ঠচ্ছবির মত চিক্কণ; যার তরুতল, নীলবহুল নিবিড় ছায়ায় স্নিগ্ধশীতল; যার ক্রোড়দেশ বিবিধ মৃগকুলের ইতস্ততঃ সঞ্চারণে প্রিয়দর্শন; সেই মধ্যমারণ্যকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই শম্বুক দুঃখ-বিনোদনের উপায় বলিয়া বুঝিল। রামচন্দ্রের হৃদয় আজ জনস্থানের প্রিয়-স্মৃতি-চিহ্ন দেখিয়া দুর্ব্বল, কাতর ও মোহাচ্ছন্ন; সে হৃদয়ে এখন প্রশান্ত-গম্ভীরভাব আনয়ন করিতে পারিলেই যে সুখ ও শান্তি লাভ হইবে—ইহা স্বাভাবিক।

রামের চিত্ত যেমন একদিকে কুসুমবৎ কোমল, অপরদিকে তেমনই বজ্রবৎ কঠোর। ইহা মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের প্রকৃতি। একদিকে—নির্ঝরিণী কুলু কুলু শব্দে ও তর তর ভাবে বহিতেছে, অপরদিকে—দাবাগ্নি হু হু শব্দে খরবেগে জ্বলিতেছে। নরপতি রামচন্দ্রে দৃঢ়তা, চিত্তসংযম, সহিষ্ণুতা ও প্রজানুরঞ্জনব্রতপালন। সীতাপতি রামচন্দ্রে কোমলতা, দৌর্ব্বল্য, অধৈর্য্য ও মর্ম্মন্তুদ রোদন।

মধ্যমারণ্যের নমনীয়া বেতসলতার মৃদুল দোলনে, স্বচ্ছসলিলা প্রবাহিণীর স্ফীত তরঙ্গে, শিশির-কষায় শল্লকীর প্রসৃত গন্ধে রামচন্দ্রের মন প্রাণ তৃপ্তি ও শান্তিলাভ করিল। শম্বূকও রামচন্দ্রকে স্থির ও শান্ত দেখিয়া অগস্ত্যদেবকে প্রণাম করিবার জন্য অগস্ত্যাশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিল।

রামচন্দ্র এখন একাকী। প্রবাহিণীর কুলুকুলুধ্বনি আর অধিকক্ষণ রহিল না, ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। শল্লকীর শিশির-কষায় গন্ধও আর ভাসিয়া আসিয়া দেহেন্দ্রিয় স্নিগ্ধ করিল না। রাম "শোকমাত্র দ্বিতীয়" হইয়া—সেই উপল-বিষম পর্ব্বতপথে বেড়াইতে লাগিলেন।

সেই সীতা-পালিত ময়ূরের দল, আজিও সীতা-সংবর্দ্ধিত তরুশিরে বসিয়া কেকাধ্বনি করিতেছে। সেই সীতাকর-লিপ্ত চত্বর-ভূমিতে পুত্রনির্ব্বিশেষ হরিণের 'পাল' আজিও পূর্ব্বমত ছুটাছুটি করিতেছে। সেই "আমঞ্জু বঞ্জুললতা" 'সেই অবিরলনীল নিচুল' তরুশ্রেণী, সেই কেতকী সুরভি সরিৎ-তট; রাম সস্পৃহনেত্রে তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই প্রস্রবণ গিরি—যাহা দূর হইতে মেঘমালার মত; সেই গোদাবরী নদী—যাহা দক্ষিণ-দিগ্বধূর হিরণ্ময়ী কাঞ্চীর মত; সেই গিরিশৃঙ্গ—যাহা পরার্থে ত্যক্তপ্রাণ মহাত্মা জটায়ুর আবাসস্থল; রাম সেই সেই স্থানগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সুখে দুঃখে ঘেরা, সেই স্মৃতিরাগে রঞ্জিত করা, সেই শয়নে স্বপনে ভ্রমনে উপবেশনের

নিয়ত সঙ্গী বনস্থলী,—রাম বর্ত্তমান ভুলিয়া অতীতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিলেন। "বিরহে তন্ময়ং জগৎ।"

কি সুন্দর বনভাগ! আর কিবা গোদাবরী সলিলে শ্যামলতরু-শ্রেণীর রমণীয় প্রতিফলন! কে যেন গোদাবরীর স্বচ্ছ-সলিলে শ্যামল তরুর শ্রীগুলিকে সাজাইয়া দিয়া গিয়াছে। প্রতিফলিত ছায়াগুলি (প্রতিবিম্ব) ইন্দ্রজাল স্পর্শে যেন সত্যকারের তরুশ্রী হইয়া দেখা দিয়াছে। তরু-শাখার অন্তরালে পক্ষিকুলের মধুর কুজন—সে কি শ্রুতিসুভগ! কে বলে বনস্থলী মৌন, জড় ও প্রাণহীনা? যার কণ্ঠে অমন কলধ্বনি, সে কি মৌন? যার স্বরে অমন মাদকতা, সে কি জড়? যার বক্ষে অমন সর্ব্বজনীন স্নেহ ও দয়া, সে কি প্রাণহীনা?

অদূরে, ওই সেই পঞ্চবটী—বহুদিনের বিবিধ বিশ্রম্ভসাক্ষী! ওই স্থানেই না—সীতার প্রিয়সখী বনদেবী বাসন্তীর বাসভবন?

এই অবস্থাবিপর্য্যাসের কালে কিরূপে রাম ওই পঞ্চবটীতে সীতার প্রিয়সখী বাসন্তীর সহিত সম্ভাষণ করিবেন? যাহার সহিত বসিয়া একদিন নন্দনের অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধ্বনি শুনিয়াছিলেন, আজ সেই সখী বাসন্তীর সহিত কিরূপে একত্র বসিয়া শ্মশানের করুণ হাহাকার তুলিবেন? এই ভাবিয়া তাঁহার মন হাহাকার করিয়া উঠিল।

তখন রামের মর্ম্মস্থল কৃতকার্য্যের অনুশোচনায় বিদীর্ণ হইতেছিল; উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে বেদনা-ক্ষীণ পঞ্জর সকল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল; ইতস্ততঃ প্রসৃত কেশভারে পূর্ণচন্দ্রবৎ মুখখানি মেঘে-ঢাকা পড়িতেছিল, বোধ হইতেছিল—অন্তঃপ্রদেশ হইতে বহির্গত যন্ত্রণার কালিমরাশি যেন সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া আছে।

রাম তখন চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখিয়া নিজ হৃদয়ের পানে চাহিয়া দেখিলেন—সেখানেও চির অন্ধকার, আলোকের রেখা মাত্র নাই। যেন

সুতীব্র বিষরস তাঁহার মর্ম্মস্থলতলে অকস্মাৎ সঞ্চারিত হইয়া পড়িল; যেন তীক্ষ্ণ শল্যখণ্ড দেহমধ্যে সহসা প্রবিষ্ট হইল; যেন দৃঢ়-বদ্ধমুখ ব্রণ বক্ষোমাঝে মুহূর্ত্তের ভিতরে ফাটিয়া গেল। ঘনীভূত শোক আসিয়া আজ তাঁহাকে বিবশ ও মূর্চ্ছিত করিয়া দিল।

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাং।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি॥

পূর্ব্বে যেখানে স্রোত বহিত, এখন সেখানে নদীর পুলিন দেখা যাইতেছে। বৃক্ষসকলের ঘনসন্নিবেশ কোথাও বিরল, বিরলভাগ কোথাও নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। বহুকাল পরে পরিদৃষ্ট এই বনটি অপর বন বলিয়া প্রতীত হইতেছে; কেবল পর্ব্বতের স্থির অপরিবর্ত্তিত সন্নিবেশ বুঝাইয়া দিতেছে—এই সেই বন।

বস্তুতঃ রামের অন্তঃ-প্রকৃতি এস্থলে বাহ্য প্রকৃতির আকারে বিবর্ত্তিতা হইয়াছে, কিম্বা বহিঃপ্রকৃতি (বনস্থলী) এবং রামের অন্তঃপ্রকৃতি একইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। রামের অন্তরে, যেস্থানে প্রণয়ের স্রোত বহিত, এখন সেস্থানে দুঃখের চড়া ধূ ধূ করিতেছে। যে হৃদয়ে মিলনের সুখরাগিণী বাজিত, তথায় এখন বিষাদের করুণসুর রণিয়া রণিয়া উচ্ছ্বসিত হইতেছে। সুখ—শোকে, মিলন—বিরহে পরিণত। রামের জীবলোক বিপর্য্যস্ত। রামকে আর রাম বলিয়া চেনা যায় না; কেবল তাঁহার সৌম্য-গম্ভীর অনুভাব-সৌভাগ্য পর্ব্বতের মত অবিচল—তাই সেই রাম বলিয়া কোনমতে বুঝা যাইতেছে। লাবণ্যময়ী মুক্তাফল-তরলা ছায়া যেমন শকুন্তলার ক্ষীণ পাণ্ডুদেহ ত্যাগ করে নাই, এই অনুভাব-সৌভাগ্যও তদ্রূপ রামের বিপর্য্যস্ত দেহ ছাড়িয়া যায় নাই।

রাম আর পঞ্চবটী দর্শনে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেছেন না; পঞ্চবটীর চিরপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখিয়া অশ্রুবেগও কোনমতে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। পঞ্চবটী ছাড়িয়া যাইতে পারিলেই যেন তিনি স্বস্তি পান, অথচ পঞ্চবটীর স্নেহ চুম্বকের মত লৌহখণ্ডবৎ তাঁহার হৃদয়টিকে আকৃষ্ট করিতেছে। যে পঞ্চবটী—সুখের সময়ে বিবাহের বাসর-গৃহের মত সুখ দিয়াছিল, স্বর্গের অমৃতের মত রসাস্বাদে তৃপ্ত করিয়াছিল; দুঃখের সময়ে রাম আজ কেমন করিয়া তাহাকে অকৃতজ্ঞের মত ছাড়িয়া যাইবেন?

আজ যে তিনি পতিপ্রাণা জানকীকে করিশুণ্ড-ছিন্ন লতিকার মত সবলে আশ্রয়চ্যুত করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন; আজ যে তিনি অনন্যাশ্রয়া প্রিয়তমার মৃণালদুর্ব্বল অঙ্গখানি হিংস্র শ্বাপদের মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দিয়াছেন; আজ যে তিনি আদর-পালিতা বিশ্বস্তা গৃহ-শকুন্তিকাকে কসাইয়ের মত ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছেন—কোন্ মুখে তিনি সেই নিজের কালা-মুখ পঞ্চবটীর কাছে দেখাইবেন? ছায়ার মত সঙ্গিনী, হোমাগ্নি-শিখার মত পবিত্রা জানকীর উপর নিন্দিত নির্ব্বাসন-দণ্ড নিক্ষেপ করিয়া এখন তার কি উত্তর দিবেন? পঞ্চবটীর প্রত্যেক তরুলতা, প্রত্যেক পশুপক্ষী এখনও সেইমত আছে, কিন্তু আজ সেই সীতা কৈ?

এইবার রামের হৃদয়-সাগরে মন্থন আরম্ভ হইল,—অমৃত আর নাই; এখন শুধু হলাহলই উঠিবে। উপায় কি? সে হলাহল এখনই যে রামের জীবন শেষ করিবে! যে সঞ্জীবন মন্ত্র এই বিষক্রিয়া নিবারণে সক্ষম, যে নীলকণ্ঠ এই বিষ জীর্ণ করিতে সমর্থ—তাহা আজ কোথায়? মূর্ত্তিমান্ আশ্বাসরূপী শম্বূকও তৎক্ষণাৎ অগস্ত্যাশ্রম হইতে ফিরিয়া অগস্ত্যদেবের শুভাশীষটি অক্ষয়কবচের মত বহিয়া আনিল। শম্বূক জানাইল—

স্নেহবৎসলা অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা বিমানাবতরণের মাঙ্গল্য-সম্ভার হস্তে লইয়া আশ্রমবাসী ঋষিবৃন্দের সহিত অযোধ্যানাথের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

যাঁহার একটী গণ্ডূষে সপ্তসমুদ্র নিমেষে শুকাইয়া গিয়াছিল, যাঁহার একটী আদেশে উন্নত-শৃঙ্গ বিন্ধ্য চিরদিনের মত নতশির হইয়াছিল, যাঁহার একটী অভিসম্পাতে ইন্দ্র-পদারূঢ় নহুষরাজ সর্পরূপে ধরাতলে পড়িয়াছিল—সেই মহর্ষি অগস্ত্যদেবের আজ্ঞা। তৎপত্নী স্নেহবৎসলা লোপামুদ্রারও অনুরোধ! রামের মোহ, দুর্ব্বলতা, অধৈর্য্য, দুঃখ ও শোক মুহূর্ত্তের মধ্যে অপগত হইয়া গেল; ঐন্দ্রজালিকের করস্পর্শে ছায়াবাজীর মত যেন সে সকল অকস্মাৎ আত্মগোপন করিল। "ভগবতি পঞ্চবটি, গুরুজনের আদেশ ও অনুরোধে আমার এই অতিক্রম মার্জ্জনা করুন" বলিয়া রামচন্দ্র অগস্ত্যাশ্রমাভিমুখে ফিরিবার উপক্রম করিলেন।

এইবার আশ্রমের মধ্যে আশ্রমরক্ষক সম্রাট্‌কে প্রবেশ করিতে হইবে, ঋষিভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ রঘুবংশতিলককে মহর্ষির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, যোগ্য সন্তানকে মাতার পবিত্র ক্রোড়ে যাইয়া উপবেশন করিতে হইবে—কাজেই এ সময়ে আপনাকে স্থির, ধীর ও অবিচলিত রাখা আবশ্যক; দুঃখ শোক, দুর্ব্বলতা, অধীরতা, ও মোহ লইয়া আশ্রমে যাওয়া চলিবে না। এখন ক্রৌঞ্চাবৎ গিরির মত উন্নতশির, স্বমহিমোন্নত ও সুদৃঢ় হইয়াই তথায় যাইতে হইবে।

"কুঞ্জৎ-কুঞ্জ-কুটীর-কৌশিক-ঘটা * * ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ"

তথায় পেচককুলের ফুৎকার-রবে ভীত বায়সের দল বংশগুচ্ছ-মধ্যে মুখ লুকাইয়া রহিয়াছে, ময়ূরের রবে কম্পিত সর্পকুল পুরাণ চন্দন তরুর কোটরে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। আর এদিকেও সত্ত্বভাবের আগমনে রামচন্দ্রের রজস্তমোভাব যাহা কিছু ছিল, মিলাইয়া গিয়াছে; ভক্তির উদয়ে আর শান্তির আবির্ভাবে মোহ এবং অশান্তি সম্পূর্ণ দূরীভূত

হইয়া পড়িয়াছে। অধৈর্য্য ও দৌর্ব্বল্য-প্রভৃতি কার্য্যগুলি স্ব স্ব কারণে অন্তর্লীন হইয়া রহিয়াছে।

তখন ইক্ষ্বাকুকুলপ্রদীপ অযোধ্যাধিপতির চিত্তকুহরে গোদাবরীর গদ্গদরবের মত আনন্দ-প্রবাহের কুলু কুলু ধ্বনি শোনা গেল। সংযম ও মোহ, সহিষ্ণুতা ও দুঃখ, চিত্তবল ও দুর্ব্বলতার কিয়ৎকালব্যাপী সংঘর্ষের ফলে এক অপূর্ব্ব তরঙ্গের উদ্ভব দেখা দিল। সেই শোক দুঃখে মরুভূ সম অনুর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্র তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে এক পবিত্র সরিৎসঙ্গম ফুটিয়া উঠিল।

অন্যোন্যপ্রতিঘাত-সঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ
কুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ।

রামচন্দ্র অগস্ত্যাশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয়াঙ্ক।

মুরলা দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র নদী; গোদাবরী উদ্দেশ্যে বহিয়া চলিয়াছে। ও শুধু নদী নহে—ও যে অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রার প্রেরিতা সখী, শিষ্যা দাসী। গোদাবরীর নিকট দূতী হইয়া সংবাদ লইয়া যাইতেছে। নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী মূর্ত্তি ধরিয়া মানবী হইয়াছে। কবির ঐন্দ্রজালিক শক্তি জড়কে চৈতন্যময়ী করিয়াছে, অচেতনে প্রাণের প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে।

পথিমধ্যে অপর একটি নদী—"তমসা" আসিয়া মিলিল ; সে নদী পাতাল-গর্ভ ভেদ করিয়া গোদাবরীতে আসিয়া মিশিয়াছে। তমসা অপেক্ষাকৃত বড় নদী, প্রকৃতি বড় ধীর ; মুরলার মত চপলা নহে। মুরলা বালিকা, তমসা প্রবীণা। তমসাও আজ শরীরিণী ; ভাগীরথীর বরে অদৃশ্যা। তমসা সীতার অপেক্ষা বয়সে বড়, মান্যেও বড়, অভিন্ন-হৃদয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত। সীতার উপর তমসার বড়ই স্নেহ। তমসার উপর সীতার বড়ই শ্রদ্ধা। পাতালবাসিনী তমসা ভাগীরথীর আজ্ঞায় সীতার সখী বা সহচারিণী হইবার জন্য পঞ্চবটীতে চলিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসরের পর রামচন্দ্র পঞ্চবটী দর্শনে আসিতেছেন। অগস্ত্যদেবের আশীর্ব্বাদ ও লোপামুদ্রার নির্ম্মাল্য মাথায় করিয়া অগস্ত্যাশ্রম হইতে ফিরিতেছেন। লোপামুদ্রা রামচন্দ্রে বড়ই স্নেহবতী, আর স্নেহও স্নেহ-পাত্রের সর্ব্বদা অনিষ্টাশঙ্কী। করুণাময়ী দেবীর ভয়—রামচন্দ্র পঞ্চবটীর "বধূসহবাস-বিস্রব্ধ সাক্ষী" স্থানগুলি দেখিয়া পাছে মোহ যান, অতি গভীর শোকক্ষোভের সংবেগে পাছে তাঁর কোন প্রমাদ ঘটে—তাই গোদাবরীর উপর আদেশ হইল—

"গোদাবরি, তুমি ধীরে ধীরে পদ্মপরাগ-সুরভি, "শীকরকণা-শীতল" তরঙ্গ-বাতাস দিয়া রামচন্দ্রের মূর্চ্ছিত জীবন তর্পিত করিও।"

রঘুকুলদেবতা গঙ্গাদেবীর ভয় আরও অধিক। তাই তিনি সরযূ-মুখে রামচন্দ্রের জনস্থান আগমনের কথা শুনিয়া গৃহাচারচ্ছলে সীতাকে লইয়া আসিয়াছেন। "শোকমাত্র-দ্বিতীয়" রামচন্দ্রের পঞ্চবটী দর্শনে যদি কোন অনর্থ ঘটে, আর সীতার দ্বারা সহজেই সে অনর্থের নিবারণ হইতে পারিবে। সীতাই যে রামচন্দ্রের মৌলিক সঞ্জীবনোপায়।

পাতালবাসিনী সীতা অবনীপৃষ্ঠচারিণী হইয়াও ভাগিরথীর বরে আজ মর্ত্ত্যলোকেরও অদৃশ্যা। দ্বাদশবৎসরব্যাপী প্রতিবিরহে সীতার সেই রাজেন্দ্র

কপোল পাণ্ডুর ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে ; সেই কুঞ্চিত কুন্তল বিলোল হইয়া মুখে ও চক্ষুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—দেখিলে মনে হয়, যেন করুণ রসের মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, বিরহব্যথা শরীর ধরিয়া দেখা দিয়াছে। সীতার সেই সুকুমার দেহখানি আজ হৃদয়কুসুমশোষী দীর্ঘ শোকে বৃন্তচ্যুত কিশলয়ের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ; সে ক্ষীণ পরিপাণ্ডু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ঘর্ম্মদগ্ধ কেতকী-গর্ভদলের নীলিমা লাভ করিয়াছে।

তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক শেষ হইল। এইবার মূল তৃতীয়াঙ্কের যবনিকা উঠিল। এই অঙ্কে মর্ত্ত্যমানবের অদৃশ্যা হইয়া সীতা পঞ্চবটীতে সঞ্চরমাণা—তাই ইহার আর একটী নাম ছায়া-অঙ্ক। রামের হৃদয়স্থা, প্রেমময়ী সীতার স্মৃতি যেন আজ প্রত্যক্ষ-দর্শনাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; "ভাবনা-প্রকর্ষাৎ স্মৃতের্দর্শনরূপতা ইতি (রামানুজ ভাষ্য)। কবি-কল্পনা চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

নেপথ্য হইতে—"প্রমাদ প্রমাদ" কি অনর্থ, কি অনর্থ—এইরূপ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। পুষ্পচয়নব্যগ্রা সীতা অমনই "সকরুণোৎসুক্যে" সেই শব্দ লক্ষ্যে কর্ণ পাতিল।.. আহা স্বহস্তপোষিত করিশিশু আজ মদমত্ত গজরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ; স্নেহব্যাকুলা সসম্ভ্রমে কয়পদ ছুটিয়া গেল। কি সুন্দর! সেই শল্লকীপল্লব-গ্রহণে ব্যাকুল করিশিশুকে সীতার মনে পড়িল ; চকিতে' বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ বনবাসস্মৃতি জাগিয়া উঠিল ; সীতা উদ্‌ভ্রান্তা হইয়া বলিয়া উঠিল, "আর্য্যপুত্র, আমার পুত্রকে বাঁচাও।" বার বৎসরের ব্যবধান পূর্ণ হইয়া গেল! তন্ময়তায় অতীত বর্ত্তমানবৎ প্রতীত হইল।

"কোথায় আর্য্যপুত্র" !! তন্ময়তা ছুটিয়া গেল। অতীত—অতীত হইয়া রহিল। বর্ত্তমান—বর্ত্তমান হইয়াই দেখা দিল। সীতা তখন সেই চকিতদশা-বিপর্য্যাসে মূর্চ্ছিতা। এমন সময়ে জলভরা মেঘের ধ্বনির মত

এক গম্ভীর মাংসল নিনাদ সীতার কর্ণবিবর ভরিয়া উত্থিত হইল; সীতার মূর্চ্ছা অমনই ছুটিয়া গেল। বহুদিনের পর ভাবাবেশও দ্রুত আর তাহার অন্তর্দ্ধানও দ্রুত। বড় আশ্বাসে বড় আহ্লাদে সীতা মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ূরীর মত চকিতা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল। সীতা-বল্লভের দূরাগত, অপরিস্ফুট (সীতার কাছে বড় পরিস্ফুট) ধ্বনি শুনিয়াই সীতা জানিতে পারিল—আর্য্যপুত্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত।

তমসার মুখে তখন সীতা শুনিল—রাজকার্য্য পালনের জন্য রামচন্দ্র জনস্থানে সমাগত হইয়াছেন। সীতাবল্লভ রামচন্দ্রের এই কঠোর রাজ-কর্ত্তব্য পালন দেখিয়া—সীতার বড় আনন্দ হইল। "দিষ্ট্যা অপরিক্ষীণ-রাজধর্ম্মঃ খলুঃ রাজা"—এইস্থানেই সীতাচরিত্রের একটী অনন্যসাধারণী বিশিষ্টতা। রামচন্দ্র যে রাজকর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতেছেন ইহাতেই সীতার আনন্দ! যে কঠোর কর্ত্তব্য পালনের জন্য রামের সীতা বিসর্জ্জন—সে কর্ত্তব্য পালিত না হইলে এই কষ্ট ভোগই যে বৃথা হয়! রামের প্রণয়ে সীতার অগাধ বিশ্বাস,—নচেৎ সীতাকে রাম সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই রাজকর্ত্তব্যের কঠোর দায়িত্ব বহন করিতে পারিতেছেন—বস্তুতঃ এ বিশ্বাস সীতার নাই; আর এমত ধারণা জন্মিলে সীতার মুখে "দিষ্ট্যা" একথা শুনিতে পাইতাম না। নিষ্কলঙ্কা—তথাপি রাম তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; লোকচক্ষুতে কলঙ্কিনী-মত করিয়া অরণ্যে বিসর্জ্জন দিয়াছেন—এ-কারণ যে অভিমান—তাহা অবশ্য সীতার বুক ভরিয়াই আছে। এই লজ্জাকর ব্যথা অবশ্য মর্ম্মস্থলে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াই আছে। "দিষ্ট্যা অপরিক্ষীণ-রাজধর্ম্মঃ খলু রাজা" এই কথাটিতে—ঐ অভিমান, ঐ ব্যথা নাই বা কোন প্রকার শ্লেষের ইঙ্গিতটুকুও নাই; ইহা উদার হৃদয়ের স্বতোনিঃসৃত বাণী। রাম শোকে মুহ্যমান্ হইয়া রাজকার্য্য হয়ত ঠিক পালন করিতে পারিবেন না, এমত আশঙ্কা সীতার

ছিল। কর্ত্তব্যচ্যুতির যে শঙ্কা কাটিয়া গেল; ইহাতেই সীতার আনন্দ। রাম অনুত্তেজিত মুহূর্ত্তে সীতার সম্মুখে যখন বলিতে পারিয়াছেন যে, "লোকারাধনার নিমিত্ত আমি স্নেহ, দয়া, বন্ধুত্ব (প্রীতি) এমন কি জানকীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি," আর আজ রামের যোগ্যাপত্নী রামপ্রিয়া সীতাও তখন না বলিবেন কেন—(ভাগ্যবশতঃ) "দিষ্ট্যা অপরিক্ষীণরাজধর্ম্মঃ খলু রাজা"।

পঞ্চবটীর সেই চিরপরিচিত তরুলতা, সেই স্বহস্তপালিত পশুপক্ষী, সেই করুণাদ্রাবিতা গোদাবরী, সেই "বহু নির্ঝর-কন্দর" গিরিতট;—রামের অন্তর্লীন দুঃখাগ্নি উদ্দামভাবে জ্বলিয়া উঠিয়া মূর্চ্ছার সৃষ্টি করিল; মূর্চ্ছা দর্শনে সীতা "ভগবতি আমার আর্য্যপুত্রকে বাঁচাও" বলিয়া তমসার পায়ে পড়িল। তমসা আজ্ঞা করিল "তোমারই প্রিয়-পাণিস্পর্শে জগৎপতি রাম বাঁচিবেন।" "যত্তবতু তত্তবতু যথা ভগবতী আজ্ঞাপয়তি"—যাহা হউক তাহা হউক—যাহা ভগবতী আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা করি। এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্থ করিয়াছেন "আমার পাণিস্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কিনা, জানি না, তবে যখন ভগবতী (তমসা) আদেশ করিতেছেন, তখন তাঁহাকে আমি স্পর্শ করি *। বঙ্কিমবাবু এই অর্থের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অতি তীব্র শ্লেষ করিয়াছেন—"স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বুঝিতে পারিলেন না, তখন যদু মধু কি বুঝিবেন!"

বঙ্কিমবাবু বলেন—"রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন—বিসর্জ্জন করিবার সময় একবার ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। আজি বারো বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ-রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার

---

* অবশ্য তাঁহার স্বকৃত (উত্তর চরিতের) সংস্কৃত টীকায়।

প্রিয়পত্নীর অধিকারে তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যাহা হউক, তাহা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করি।" ইহা ভাবিয়া সীতা স্পর্শ করিল, রামও চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবুর অর্থের পরিপোষক প্রমাণ এই যে, তৎপরেই সীতা বলিলেন "ভগবতী তমসে, এস আমরা ফিরিয়া যাই। যদি ইনি (রাম) আমাকে দেখিতে পান, তবে এই অননুজ্ঞাত আগমনের জন্য (স্পর্শ ত দূরের কথা) আমার মহারাজ কুপিত হইবেন"।

অবশ্য বঙ্কিমবাবুর অর্থটি সূক্ষ্ম সমালোচনার বিচারে ভালই প্রতীতি হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতটিও আর-একদিক্ দিয়া সমর্থন করা যায়। রাম মূর্চ্ছিত—এমত সঙ্গীনসময়ে অত মান অভিমানের তর্ক উঠিতে পারে না। "বাঁচিবেনই" এমত নিশ্চিত বিশ্বাস সীতার থাকিতে পারে না। তবে ভগবতী আদেশ করিতেছেন, তখন স্পর্শই কর্ত্তব্য। সীতাকে তখন তমসা যে আজ্ঞাই করিবে, না ভাবিয়া চিন্তিয়া সীতা তখনই তাহা করিতে প্রস্তুত। রামের জীবন সঙ্কটাপন্ন, সে সময়ে সীতার মনে ঐ অভিমানোত্থিত বিতর্ক না উঠিবারই কথা। পরে যখন রাম জীবন পাইলেন, তখনই "অননুজ্ঞাত সন্নিধান-জন্য" শঙ্কা হইল। শঙ্কা, চৈতন্য লাভের অগ্রে নহে। তারপর, হরিচন্দন পল্লবের প্রলেপবৎ চিরপরিচিত স্পর্শ রামের অঙ্গে নিষ্পীড়িত চন্দ্রকিরণ-রসের সেক দিল। এস্পর্শ চিত্তের সঞ্জীবন অথচ মোহকর; মুহূর্ত্তের মধ্যেই সন্তাপজ-মূর্চ্ছা নাশ করিয়া আনন্দের জড়তা আনিয়া ফেলিল। মূর্ত্তিমান্ প্রসাদের মত এই স্নেহার্দ্র-শীতল স্পর্শ কি ভুলিবার? কোথায় প্রিয়ে জানকি, কোথায় আমার সেই আনন্দদায়িনী দেবী প্রতিমা?" রাম চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—"কোথায় প্রিয়তমা!" ছায়ামূর্ত্তি ভাগীরথীর বরে যে রামের অদৃশ্যা! রাম তখন ভাবিয়া লইলেন—"নিজেরই প্রগাঢ় চিন্তা

আজি মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে প্রতারণা করিয়া গেল। ইহা তন্ময়তাজনিত একটী ভ্রান্তিমাত্র"।

সীতার স্বকরপালিত সেই করিশিশু মদমত্ত গজরাজকে পরাজিত করিল। আনন্দে সীতা সেই সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিল—দীর্ঘায়ু বৎস আমার—সৌম্যদর্শনা প্রিয়ার সহিত যেন অবিযুক্ত থাকে। বিরহেই সীতার যত ভয়। একে পতিবিরহ—তাহাতে আবার পুত্র-বিরহ! রামায়ণের সীতাকে কেবল পতিবিরহই সহ্য করিতে হইয়াছিল। ভবভূতির সীতার দুই প্রকার বিরহই সমভাবে ভোগ হইতেছে। উত্তর চরিতে সীতা পাতালে মাতার নিকট অবস্থিতা; পুত্রদ্বয় স্তন্যত্যাগের পর হইতেই বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত। (রামায়ণে, বাল্মীকি-আশ্রমেই সীতা সপুত্রক অবস্থিতি করিত)।

কদম্ব-শাখায় উন্নতশিখ, মণিময় মুকুটের মত প্রিয়া-সমেত একটী ময়ূর বসিয়াছিল। সেই সময়ে কি জানি কেন, সে স্বভাবসিদ্ধ কেকারবে ডাকিয়া উঠিল। বাসন্তী দেখিল—সীতার সেই পালিতপুত্র ময়ূর-শিশু! সীতা দেখিয়াই চিনিল। রামের নেত্রে অতীতের ছবিটা ভাসিয়া উঠিল,—সীতা ক্ষুদ্র করতলে করতালি দিতেছে, আর সেই ময়ূর-শিশুটী সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, আবার সেই নৃত্যের সঙ্গেসঙ্গে সীতার চক্ষুপল্লবও কেমন সুন্দরভাবে ঘুরিতেছে ও ফিরিতেছে। সীতার সযত্নরোপিত কদম্ব-বৃক্ষে দুই চারিটী ফুল ফুটিয়াছে। সেই বৃক্ষেই সীতার পালিত গিরিময়ূরটীও আশ্রয় লইয়াছে। রাম দেখিলেন—পক্ষীজাতিও পরিচয় স্মরণ করে এবং স্নেহের মর্য্যাদা রাখে। আর তিনি—শ্রেষ্ঠজন্ম মানব হইয়াও কি করিলেন? রাম কাঁদিতে লাগিলেন। বাসন্তী তখন কদলীবন-মধ্যবর্ত্তী একটি শিলাতল দেখাইয়া রামকে বসিতে বলিল। চতুর্দ্দিকে সীতার সেই প্রিয় হরিণের দল আজিও

তাহারা চরিয়া বেড়াইতেছে। এইস্থানে বসিয়াই—না—সীতা তাহাদের কত আদর করিয়া খাওয়াইত। কাঁদিতে কাঁদিতে রাম সে স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইয়া বসিলেন।

সখী বাসন্তী সীতার পূর্ব্বস্মৃতি উদ্রেক করিয়া রামকে কাঁদাইতেছে, আর মন্দভাগিনী সীতাও পাষাণীর মত তাহা সহ্য করিতেছে। সেই পঞ্চবটী, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, সেই "বিবিধবিশ্রম্ভসাক্ষী গোদাবরী-কাননোদ্দেশ", সেই পুত্রনির্ব্বিশেষ পশুপক্ষী, তরুলতা—এ সকল থাকিয়াও (সীতার কাছে) নাই। সীতা আর সীতা নহে। মর্ত্ত্যের পতি-সোহাগিনী—রাজরাণী আজি পাতালবাসিনী, বিরহিণী ও ভিখারিণী রাজরাজেশ্বরী আজ হায় ছায়ামাত্র-ধারিণী! এদিকে বিকলেন্দ্রিয়, পাণ্ডুবর্ণ ও শোকদুর্ব্বল রামের অবস্থা দেখিয়া অভাগীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সীতা সেই অশ্রুপতনোদ্গমের অন্তরালেই রামকে সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছিল। সীতার সেই স্নেহ-নিঃস্যন্দিনী দৃষ্টি কখন সুখে, কখন দুঃখে, কখন বা শূন্যতায় অশ্রুবর্ষণ করিতেছে; দর্শনতৃষ্ণায় সে দৃষ্টি উত্তান-দীর্ঘা, বিস্ফারিতা ও দীর্ঘবৎপ্রতীতা। স্নেহময়ী তমসা দেখিল—সে দৃষ্টি দুগ্ধনদীর পয়োধারায় হৃদয়েশ্বরকে স্নান করাইতেছে। তখন বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ, যাহাকে—আমার প্রাণ, আমার দ্বিতীয় হৃদয়, নয়নের জ্যোৎস্না, অঙ্গের অমৃত" এইপ্রকার শতশত বাক্যে ভুলাইতেন, সেই মুগ্ধা সীতাকে, (১)—বলিতে বলিতে বাসন্তী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। এই বক্তব্যটী শেষ না করাই এস্থানে সৌন্দর্য্য! অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে ন্যূনপদতা স্থান-বিশেষে একটি গুণ। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর বাসন্তী উত্তরে শুনিল —"লোকে যে সহ্য করিল না" অর্থাৎ আমি রাজা, প্রজার প্রতিনিধি; প্রজাদের যখন সহ্য হইল না, কাজেই আমিও সেই মতেই চলিলাম।

* বক্তব্য ছিল, নির্ব্বাসন দিলেন।

এতদিন রামের মনে এই আত্মপ্রসাদ ছিল যে, তিনি প্রজার মতেই চলিয়া প্রজানুরঞ্জন করিয়া যশোভাগী হইয়াছেন। সেই আত্মপ্রসাদের উপরই বাসন্তী আঘাত দিল, জানাইল—

"অয়ি কঠোর! যশ কিল তে প্রিয়ং কিমযশো নন্বু ঘোরমতঃপরং।" অয়ি কঠোর, যশ এত আপনার প্রিয়; আর এই সীতা, বিসর্জ্জনে অযশ কতদূর হইল, তাহা কি জানেন? সীতা প্রাণের প্রাণ, সে, প্রিয় হইল না; প্রিয় হইল, কি, না—যশ। ওহে যশোলোলুপ, সীতা-বিসর্জ্জনে কি, আপনার যশ হইল, না—অযশই হইল? বাসন্তীকে এত বড় আঘাত করিতে দেখিয়া সীতাও তাহাকে দারুণা ও কঠোরা বলিয়া অনুযোগ না করিয়া পারিল না। "হরিণনয়না স্বভাবভীরু সীতার বনে কি অবস্থা হইল"—(বাসন্তীর) এই প্রশ্নের উত্তরই রাম দিলেন। যে আত্মপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ হইল—সে বিষয়ে আর কোন কথা হইল না।*

"সখি কি আর মনে করিব? সেই (১) "ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টি" সেই "পরিস্ফুরিত-গর্ভভরালসা" জানকীর, "মৃদুমুগ্ধ-মৃণালকল্পা জ্যোৎস্নাময়ী অঙ্গলতিকা" নিশ্চয়ই রাক্ষসদিগের দ্বারা চিরদিনের মতই বিলুপ্ত হইয়াছে।" আত্মপ্রসাদও নষ্ট হইল, সীতাও চিরদিনের মতই গেল। তবে কি রহিল? মুক্তকণ্ঠে রাম তখন রোদন করিয়া উঠিলেন। হৃদয়টা বিদলিত হইয়া যাইতেছে, তথাপি দ্বিধা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে না। অন্তর্দ্দাহ সারা অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে অথচ একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে না। কি কষ্টকর অবস্থা!

বাসন্তী কাতরতার পরাকাষ্ঠায় উপনীত দেখিয়া রামকে ধৈর্য্য ধরিতে কহিলেন। রামের শোকসাগরের অতিগভীর আবর্ত্ত বাসন্তী স্থির রাখিতে চাহিল। রাম তা শুনিয়া স্তম্ভিত! সীতাশূন্য দ্বাদশবৎসর অতিক্রান্ত

ত্রস্ত+ভীত+ একহায়ন+এক বৎসর বয়স। কুরঙ্গ+হরিণ

হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সীতার নামটিও পৃথিবীতল হইতে লুপ্ত হইতে চলিল,—তথাপি রাম আজও বাঁচিয়া আছে। এ অপেক্ষা স্থির থাকা আর কাহাকে বলে? ধৈর্য্য আর কাহার নাম?

সীতার সব দুঃখ গেল। অভাগীর পরে এত প্রেম, অভাগীর জন্য আর্য্যপুত্রের এত কষ্ট! আর এ নির্ব্বাসন সার্থক! রামের এই প্রেমগর্ভ প্রিয়বচনে সীতা মোহিতা হইয়া পড়িল। তমসা দেখিল, সর্ব্বনাশ! এখন সীতাকে এ স্থান হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াই যে দুষ্কর হইবে, আর সীতাও কি ইহার পরে ধৈর্য্য ধরিতে পারিবে? রামই এত অধীর, সীতার কাছে সংযম আশা করাই যে তবে বৃথা? বৎসলা তমসা সীতাকে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইয়া বলিল—

"বৎসে, নৈতাঃ প্রিয়তমা বাচঃ স্নেহার্দ্রাঃ শোক-দারুণাঃ।
এতাস্তা মধুনোধারাশ্চ্যোতন্তি সবিষাস্তয়ি"॥

বৎসে, এ বড় মনোহারী বাক্য নয়! এ স্নেহে আর্দ্র বটে কিন্তু শোকে দারুণ; তোমার কাছে ইহা বিষমিশ্র মধুর ধারা।

বাসন্তী দেখিল, রামের হৃদয় অতীব নিষ্কম্প অথচ স্তম্ভিত; আবেগে একেবারে আত্মহারা। সীতা-বিষয়ক প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে রামের মনকে লইয়া যাইতে পারিলে এ কষ্ট দূর হইতে পারিবে—সেই আশায় বাসন্তী রামকে তখন জনস্থানের অন্যান্য ভাগগুলি দেখাইতে লাগিল। সকল ভাগেই যে সীতার ছবি, সকল স্থানেই যে সীতার স্মৃতি! বাসন্তী দুঃখেরই উদ্দীপক স্থানগুলিকে বিনোদের উপায় বলিয়া মনে করিল। বাসন্তী ভুক্তভোগিনী নহে; নিজে ভুগিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহা তাহার জন্মে নাই—তাই সে ভুল করিল। সীতা ঠেকিয়া শিখিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে—কাজেই তাহার কাছে সে ভুল ধরা পড়িল। বাসন্তী যে ইচ্ছাপূর্ব্বক রামকে কষ্ট দিবার জন্য জনস্থানের অন্যান্য ভাগগুলি

দেখাইতে লইয়া যায় নাই—তাহা তাহার স্বগতঃ উক্তিতে সুস্পষ্টই বুঝা যায়—"কষ্টমত্যাপন্নো দেবঃ, তদাক্ষিপামি তাবৎ"

বাসন্তী একটী লতাগৃহের দ্বারে রামকে লইয়া দেখাইল, ঐ সেই,—

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণা
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্ গোদাবরীসৈকতে
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুড্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ ॥

সীতার সেই সুন্দর মূর্ত্তিটি—কাতরতানিবন্ধন সেই মুগ্ধ প্রণামাঞ্জলি—রামের চক্ষুতে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। প্রতিপদে কেবল হৃদয় লইয়া ঘাত প্রতিঘাত; মনস্তত্ত্বেরই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ; আদিকরুণেরই অপূর্ব্ব লহরীলীলা!

রাম গাঢ় তন্ময়তাবশে চারিদিকেই সীতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতার স্মৃতি আজ মূর্ত্তি ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাম তাহাকে (অবছায়া রকমে) পাইয়াও পাইতেছিলেন না। প্রেমবিহ্বল ভাবপ্রবণ রাম, সীতার স্মৃতিচিহ্নের মধ্যেই তাহার ছাবটি প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। বলিলেনও তাই, "চণ্ডি জানকি, তুমি চারিদিকেই আমাকে দেখা দিতেছ; তবে অনুকম্পা করিতেছ না কেন?" সীতা যেন অভিমানবশে রামকে দেখা দিয়াও ধরা দিতেছিল না। প্রণয়কোপে কোপনা হইয়াছে বলিয়াই সীতাকে রামের "চণ্ডী" এই সম্বোধন।

রাম চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—সীতা নাই। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, দেহের বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিল, নিখিল চরাচর শূন্যবৎ প্রতীত হইল। তখন রামের বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল; দারুণ মোহ চারিদিক দিয়া তাঁহাকে ছাইয়া ফেলিল। রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

সীতাও মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা। তমসার মুখে "তাহার পাণিস্পর্শই রামচন্দ্রের

জীবনলাভের একমাত্র উপায়"—শুনিয়া সীতা সসম্ভ্রমে রামের হৃদয় ও ললাট স্পর্শ করিল। ইহা দ্বিতীয়বার স্পর্শ—কাজেই মনে আর কোন সঙ্কোচ, ভয় বা ভাবনা কিছু নাই। রামেরও চেতনা ফিরিয়া আসিল। সেই স্পর্শের মাদকতায় বিভোর রামচন্দ্র আনন্দ-নিমীলিত নয়নেই বাসন্তীকে কহিলেন—"সখি বাসন্তি, কি আনন্দ! জানকীকে পাইয়াছি।" কিন্তু গাঢ় তন্ময়তাজাত বিভ্রান্তিতেও কদাচিৎ এমত অবস্থা ঘটিতে পারে। অবশ্য এস্থানে ছায়াসীতাই কারণ, বিভ্রম নহে। ভালবাসার অমৃতময় সুখ-স্পর্শে সীতার বহুকালের সন্তাপ কোথায় চলিয়া গেল; স্বেদসিক্ত বাহু, বজ্রলেপবদ্ধ—অবশ হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন স্বেচ্ছাস্পর্শ, অমৃত-শীতল কঙ্কণধর সীতার বাহুটী রাম অনায়াসেই ধরিয়া ফেলিলেন। সেই ললিতলবলীপল্লববৎ সুকুমার, সেই তুষারকরকাসদৃশ সুশীতল, চিরপরিচিত বাহুর স্পর্শে রামের ইন্দ্রিয়, আবেশে শিথিল ও জড় হইয়া আসিতে লাগিল। যেমনই রাম—"সখি বাসন্তি, এই ধর" বলিয়া তাহাকে বাহুটী ধরিতে বলিলেন, সীতা অমনই সসম্ভ্রমে সে বাহুটী সরাইয়া লইল। রাম অনুভব করিলেন, জড় হইতে যেন সহসা জড় খসিয়া গেল।

রামের স্পর্শ—বহুদিনের পর সেই আবেশময় স্পর্শ—সীতাও জ্ঞান হারাইল। চক্ষু দুইটী আবেশে মুদিয়া আসিল, ইন্দ্রিয় শ্লথ হইয়া গেল; সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই রাম সীতার বাহু ধরিয়া ফেলিলেন। তখন দুইজনের স্পর্শে দুইজনেই বিভোর; সে সময়ে কাহারও চেতনা নাই। সে অবস্থায় রক্ত-চলাচল বন্ধই হইয়া গিয়াছিল; চারিটী বাহুই অবশ হইয়া ভাবাবেশে ঈষৎ কাঁপিতেছিল মাত্র। যে সময়ে সেই স্পর্শবিচ্যুতি ঘটিল, তখন রাম অনুভব করিলেন "জড় হইতে জড় খসিয়া গেল।" স্পর্শকালে কিন্তু জড়ে জড় ছিল বা কম্পবানে কম্পবান্ কিছু ছিল—এ উপলব্ধি ছিল না। সীতা সরিয়া গেল, আর রামের অপ্রকৃতিস্থ, বিস্মিত

চক্ষু দুটী চতুর্দ্দিকে সীতার অনুসন্ধানে বৃথাই ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তমসা বর্ণনার ভিতর দিয়া এইস্থানেই সীতার একটী সুন্দর ছবি ফুটাইয়া তুলিলেন। একটু হাসির সহিত, একটু কৌতুকের সহিত তমসা সীতার পানে স্নেহভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—

সস্বেদরোমাঞ্চিত-কম্পিতাঙ্গী জাতা প্রিয়স্পর্শসুখেন বৎসা।
মরুন্নবাম্ভঃ-প্রবিধুত-সিক্তা কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব॥

সীতা স্বেদজলাসিক্তা, কদম্বযষ্টিও নবজলসিক্তা। সীতা রোমাঞ্চিতা, কদম্বযষ্টিও স্ফুটকোরকা। সীতা কম্পমানা, কদম্বযষ্টিও বায়ুচালিতা। বৎসা সীতাই আজ কদম্বযষ্টির অবস্থায় উপনীতা। গুরুজনের মুখে কদম্বযষ্টির সহিত আপনার তুলনা শুনিয়া সীতা বড় লজ্জা প্রাপ্তা হইল। ভগবতী কি ভাবিবেন? যিনি আমাকে-কলঙ্কিনীরূপে দশের কাছে দাঁড় করাইয়া নির্ব্বাসিতা করিলেন—তাঁহার উপর এখনও এত অনুরাগ! সীতা বড় কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। তাহার নারীহৃদয় তাহারই অজ্ঞাতে কিছু কুণ্ঠিত, আত্মসম্মান একটু আহত হইয়া পড়িল। তবে গাঢ় ভালবাসার কাছে ও সমস্ত তুচ্ছবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। ও সকল ফেনা বুদ্বুদের মত উপরে ভাসিয়া থাকে মাত্র।

রাম কিছু বুঝিতে পারিতেছিলেন না! যদি সত্যই সীতা আসিত, তবে বাসন্তী কেন তাহাকে দেখিতে পাইল না? তবে কি সে আসে নাই? নিশ্চয়ই তাই! এ কি স্বপ্ন? কৈ, আমি ত নিদ্রিত নহি! তখন রাম নিশ্চয় করিলেন—

সর্ব্বথা স এব অনেকবার-পরিকল্পনা-নির্ম্মিতো বিপ্রলম্ভঃ পুনপুনরনুবধ্নাতি মাং (কষ্ট দিতেছে)।

রামের গাঢ় স্মৃতি সীতার ছায়া ধরিয়া রামকে মধ্যে মধ্যে ছলনা করিত, আর আজি সীতা সশরীরে ছায়ামূর্ত্তিধারিণী।

বাসন্তী রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধপ্রসঙ্গ তুলিয়া বীরের হৃদয়ে উত্তেজনা আনিবার চেষ্টা করিল। বীরত্বের উদ্দীপনা, দুঃখশোক দূর করিয়া বলই আনিয়া দিয়া থাকে। রামের চিত্তে কিছু ফল ফলিল। সীতার অবস্থা কিন্তু আরও সঙ্গীন হইল,—অতীত দৃশ্য তখন প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাসিত। স্মৃতি অনুভূতির আকারে বিবর্ত্তমানা। মুহূর্ত্তের জন্য বিভ্রম ও সম্মোহের আবির্ভাব। ভাবাবেগে উন্মত্তা হইয়া সীতা "আর্য্যপুত্র আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। উন্মত্ততার পরই অবসাদ, প্রকৃতিরই নিয়ম। সীতাও শুনিল, রাম বলিতেছেন "এ বিরহ নিরবধি, ইহার কোন প্রতিকার নাই"। যেটুকু আশা ছিল, তাহাও নিঃশেষ হইল। আশা গেলেই সকল ফুরায়; সীতারও সবই ফুরাইল,—অবসন্না সীতা "আমি জন্মের মত গেলাম" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। রাম আর কাঁদিতে পারেন না—সীতার স্মৃতিচিহ্নগুলি আর দেখিতে পারেন না—তখন তিনি সেইস্থান ত্যাগ করার জন্য বাসন্তীর নিকটে অনুমতি চাহিলেন। রাম চলিয়া যাইতে চাহেন সীতা কিন্তু উদ্বেগে ব্যাকুলা হইয়া "ভগবতি তমসে, আর্য্যপুত্র যে চলিয়া যাইতেছেন" বলিয়া তমসাকে জড়াইয়া রহিল। কি ঔৎসুক্য, কি উদ্বেগ, কি কাতরতা, কি বা মোহ! রাম সীতাকে বনে নির্ব্বাসন করিয়াছেন—কাজেই তাঁহার পক্ষে সেই স্মৃতি-চিহ্নগুলি দর্শন করা বড়ই কষ্টকর। সীতা ত আর নিজে ত্যাগ করে নাই, শত দুঃখের মধ্যেও ইহাই সীতার সান্ত্বনা। তদ্ভিন্ন তাহার অনুতাপের ও লেশমাত্র কারণ নাই। নিজহস্তে হৃৎপিণ্ডচ্ছেদের যে কি জ্বালা, তাহা রামই জানেন; সীতা ত আর তাহা জানে না। তদ্ভিন্ন রামকে পতিপ্রাণা সীতা চক্ষুর উপর দেখিতে পাইতেছে, রাম কিন্তু সীতাকে আদৌ দেখিতে পাইতেছেন না!

সীতা চলিয়া যাইতে চাহিবে কেন? কত কালের পর যে, সীতা

আজি প্রাণ ভরিয়া সেই দুর্লভদর্শন প্রিয়তম রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছে; কেমন করিয়া সে, স্পৃহণীয় এই স্থান ছাড়িয়া যাইবে? রাম সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না, দেখার বলবতী তৃষা উত্তরোত্তর তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাম সীতাকেই দেখিতে চান! সীতা কোথায়? অগত্যা, অশ্বমেধযজ্ঞার্থে নির্ম্মিত হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি দেখিয়া রাম আপনার বাষ্পদিগ্ধ চক্ষু তৃপ্ত করিবেন, স্থির করিলেন।

কি, সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ! আর তাহা অযোধ্যায়! অশ্বমেধযজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণীর নিমিত্ত? সীতা কৃতার্থা হইল। পরিত্যাগ জনিত লজ্জাশল্য তাহার হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইয়া গেল। শিথিলবৃন্ত ফলটী ধৈর্য্যবন্ধনে বদ্ধ রহিল।

সেই হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি ধন্যা—যে আজ জীবলোকের আশাভরসা হইয়াছে। এ এক আশ্চর্য্য প্রকারের ঈর্ষা ও অসূয়া! নিজে অধন্যা, হতভাগিনী কিন্তু আপনার প্রতিমূর্ত্তি আজ কি ধন্যা, কি সৌভাগ্যবতী! নিজের উপর এই সুন্দর ঈর্ষা ও অসূয়ার ভাবটী বড়ই উপভোগ্য।

বাসন্তী রামের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের মত দিল। তমসাও সীতাকে বলিলেন "এখন চল বৎসে, আমরাও যাই।" সীতা মুখে বলিল মাত্র, "চলুন যাই", কিন্তু সে আজ কেমন করিয়া যাইবে? তাহার তৃষ্ণাদীর্ঘ চক্ষু যে, প্রিয়তম রামচন্দ্রে আজি দৃঢ় নিখাত হইয়া আছে।

রামচন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া অযোধ্যায় চলিয়া যাইলেন। এদিকে সীতাও তমসার অঙ্গে ভর দিয়া ধীরে ধীরে ছায়াখানির মত চলিয়া গেল। অশরীরিণী স্মৃতিরূপা রামের ছায়াই যেন সম্মুখ হইতে নীরবে প্রস্থান করিল।

এই তৃতীয়াঙ্কে একই করুণরস (আলঙ্কারিকমতে অবশ্য করুণবিপ্রলম্ভাখ্য আদিরস) নানা "ব্যভিচারী" ভাবের মধ্য দিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই করুণরস

বর্ত্তমান। লজ্জা, নির্ব্বেদ, দৈন্য, জড়তা, ঔৎসুক্য, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, স্মৃতি ও মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবগুলি একই করুণরসকে বিবিধ আকার দিয়াছে। তাই এই একই করুণরস সারা-তৃতীয়াঙ্ক ব্যাপিয়া প্রবহমান থাকিয়া এক অপূর্ব্ব কবিত্বের বিকাশ করিয়াছে। বিশ্ব-সাহিত্যে এ কবিত্বের তুলনা নাই। কোন সমালোচক বলিয়াছেন (বঙ্কিমবাবু), নাট্য হিসাবে তৃতীয়াঙ্কের তেমন মূল্য নাই। সে নাট্য কি ইংরেজি ? সংস্কৃত নাট্য অবশ্যই নহে। কোথায় কোন্ ব্যভিচারীভাব কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহা টীকার সহিত তৃতীয়াঙ্কটী মিলাইয়া পড়িলে সকল পাঠকই বুঝিতে পারিবেন। আর জানিতে পারিবেন, একই করুণস্রোত কিভাবে কত দিক্ দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কবির সহিত সকলেই এখন একবাক্যে বলিবেন—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদা
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
আবর্ত্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারা
নম্ভো যথা, সলিলমেবতু তৎসমগ্রং ॥

কি সাহিত্যহিসাবে কিবা নাট্যহিসাবে তৃতীয়াঙ্কের তুলনা নাই।

"রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব"

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্কে বিষ্কম্ভকে সৌধাতকি ও ভাণ্ডায়ন নামে বাল্মীকির দুইজন শিষ্য দেখা দিল। সৌধাতকি পাঠে অমনোযোগী, ক্রীড়ায় বাসনী, ব্যবহারে

দুর্ব্বিনীত আর সর্ব্বত্রই অসংযতবাক্। ভাণ্ডায়ন তাহার বিপরীতই ছিল; বাল্মীকির উপযুক্ত ছাত্র; কি বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, কি ভদ্রোচিত ব্যবহার, কি সংযত বাক্, কিবা সংযত মধুর বাণী। ভাণ্ডায়নের কথায় জানিতে পারা গেল যে, রাজর্ষি জনক সীতার দুর্ব্বিপাকজনিত দুঃখে বানপ্রস্থাশ্রমে চন্দ্রদ্বীপ-তপোবনে এতদিন তপস্যায় রত ছিলেন, আর আজ সেই তপোবন হইতে বাল্মীকি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজর্ষি জনক আজ সীতাশোকে দহ্যমান্ বনস্পতির অবস্থায় উপনীত। সীতার সে নির্ব্বাসন-দুঃখে ব্রহ্মবাদী রাজর্ষির মর্ম্মস্থল ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সে শোক, সে দুঃখের বিরাম নাই। বশিষ্ঠ ও বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ শেষ করিয়া ক্লান্ত রাজর্ষি বাল্মীকি আশ্রমে বহির্বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। অবসাদে ক্লান্তিতে তাঁহার চক্ষু দুইটী অর্দ্ধ মুদ্রিত। সেই মুদ্রিত চক্ষুর উপর সীতার সেই কাঁদ কাঁদ মুখখানি অস্পষ্ট ভাসমান। একে বার্দ্ধক্যতায় দারুণ ব্যথা —তার উপর পরাক ও শান্তপন প্রভৃতি কঠোর ব্রতপালনের কষ্ট, তথাপি দগ্ধদেহের বিনাশ নাই। আত্মঘাতীর গতি অন্ধতামিস্র লোকে,—কাজেই ব্রহ্মবাদী ঋষি স্বেচ্ছায় দেহপাত করিতে পারেন না; অথচ সেই দেহভার আর বহন করাও তাঁহার পক্ষে এখন অসম্ভব।

মনে পড়ে যখন সীতার সেই নির্ব্বাসন দণ্ড, তখন জনকের ধৈর্য্য আর থাকে না। বসুন্ধরাপর্য্যন্ত কঠোরা বলিয়া অনুযোগের পাত্রী হয়েন। "বসুন্ধরে, অগ্নি যাহার পবিত্রতার সাক্ষী, সেই স্বতঃপবিত্রা তনয়ার এই কুৎসিত নির্ব্বাসন মা হইয়া কেমন করিয়া সহ্য করিলে?"

ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ আজ সমাপ্ত হইয়াছে। বশিষ্ঠদেব, অরুন্ধতী ও কৌশল্যাসহ ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়াছেন। সেই পুণ্যশ্রীললাম-ভূতা সীতা নাই; সে রাজলক্ষ্মী-অধ্যাসিত রাজ্য নাই। রাজধানী এখন শ্রীহীনা; তথায় আর সুখ নাই। কৌশল্যাদির মনেও শান্তি নাই। বশিষ্ঠ

দেবের অভিপ্রায়-অনুসারে ফিরিবার পথে সকলে বাল্মীকি আশ্রমে উপনীত। আসিয়া দেখেন, রাজর্ষি জনক তথায় উপস্থিত। হায়, কৌশল্যা কেমন করিয়া রাজর্ষি জনকের নিকট মুখ দেখাইবেন! সীতা পরিত্যাগ করিয়া রাম যে কেবল রাজর্ষির মাথায় বেদনাভার চাপাইয়াছেন তাহা নহে, দারুণ অপমানের বোঝাও চাপাইয়াছেন। নিজের পুত্রের এই আচরণে কৌশল্যা বড় লজ্জিতা, বড় দুঃখিতা। রাজর্ষির সাক্ষাতে বাহির হইতে তিনি চাহেন না। এদিকে বশিষ্ঠদেবের আদেশ, নিজে যাইয়া রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তখন অগত্যা কৌশল্যা রাজর্ষির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কৌশল্যাকে দেখিয়া কে বলিবে যে, সেই কৌশল্যা! দশরথের গৃহের সেই লক্ষ্মী আজি দীনা ভিখারিণীর মত উপস্থিতা; সেই মণিমাণিক্য-ভূষিতা রাজরাণী আজি বিধবার সাজে সজ্জিতা। অবস্থার কি পরিবর্তন! জনকের নিকট যে কৌশল্যা একদিন মূর্তিমান্ মহোৎসবের মত ছিল, আর আজি সেই তাহারই দর্শন, ক্ষতে লবণক্ষেপের মত কষ্টকর দাঁড়াইয়াছে। দশরথের মত স্বামীর সেই দুঃখকর মৃত্যু, তার উপর স্বতঃশুদ্ধা সীতার এই অপমানজনক নির্বাসন রাজ্ঞীর শরীর ও মনকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। ফলপুষ্পময় রাজোদ্যান আজ শ্রীহীন, আগাছায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কৌশল্যার চরণ আর বহে না। কুলগুরুর আদেশ, তাই তিনি কোন মতে আপনাকে ধরিয়া রাখিয়া যন্ত্র মত অগ্রসর হইতেছেন। হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া দুরু দুরু কাঁপিতেছে। ভিতরের কথঞ্চিৎ-রুদ্ধ ব্যথা আজ দ্বিগুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। প্রিয়জন-দর্শনে ব্যথা প্রবল হইয়া উঠে, ইহাই মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম; কৌশল্যারও তাহাই হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন,—

দৃষ্টে জনে প্রেয়সি দুঃসহানি
স্রোতঃসহস্রৈরিব সংপ্লবন্তে ॥

প্রিয়জন সমাগমে দুঃসহ দুঃখ, সহস্র-স্রোতোধারায় মানবকে ভাসাইয়া লইয়া যায়! কুমারসম্ভবে কালিদাসও বলিয়াছেন—

"স্বজনানি হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে"

বহুদিনের বিস্মৃতিতে শোকের উপর যে আবরণ পড়ে, প্রিয়জনের সাক্ষাতে সেই আবরণ দূর হইয়া যায়। আবরণই এখানে দ্বার।

কঠোর কর্ত্তব্যের নিকট নিজের দুঃখ শোক তুচ্ছ করিয়া কৌশল্যা জনকের সাক্ষাতে উপস্থিতা। "স্বামীর প্রাণোপম বন্ধু, বৎসা সীতার স্নেহময় পিতা, নিজের পরমাত্মীয় সুহৃৎ, সেই রাজর্ষি জনক কি এই? এই "অনুপস্থিত মহোৎসব"—দিনে আমি কিরূপে সম্ভাবিতা হইব"—কৌশল্যা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

রাজর্ষি জনক ভগবতী অরুন্ধতীর নিকট যাইয়া ভূতলনমিত শিরে জগদ্বন্দ্যা উষাদেবীর মত তাহাকে বন্দনা করিলেন। সে বন্দনাটী বড় মধুর। অতীত ভারতে উপযুক্ত রমণীর মর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহার একটি চিত্র পাওয়া গেল।

যয়া পূতম্মন্যো নিধিরপি পবিত্রস্য মহসঃ
পতিস্তে পূর্ব্বেষামপি খলু গুরূণাং গুরুতমঃ।
ত্রিলোকীমঙ্গল্যামবনিতললোলেন শিরসা
জগদ্বন্দ্যাং দেবীমুষসমিব বন্দে ভগবতীং ॥

লোকে আশীর্ব্বাদ করে, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক। অরুন্ধতী আশীর্ব্বাদ করিলেন "পরংজ্যোতিস্তে প্রকাশতাম্"—সেই পরমজ্যোতি তোমাতে প্রকাশিত হউক।

কঞ্চুকি রাজান্তঃপুরের রক্ষক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাত্র। সেই পুরাকালেও

ব্রাহ্মণের দাসত্ব। বাস্তবিক এ অধঃপতন কালিদাস ও ভবভূতির আমলেরই। রাজর্ষি, কঞ্চুকিকে "আর্য্য" সম্বোধন করিয়া তাঁহার সম্মান-সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও মহানুভবতা প্রদর্শন করিলেন, "আর্য্য, প্রজাপাল-মাতুর্হি কুশলং ?" প্রজাপালনের অনুরোধে যে নিজের স্ত্রীকে, স্বতঃ-পবিত্রা সীতার মত প্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারে, সেই প্রজা-পালক রাজার মাতার কুশল তো ?

কি মর্ম্মান্তিক উপেক্ষা, কি স্তিমিত ঔদাসীন্য! ধিকৃত হৃদয় হইতে প্রচণ্ড জ্বালার একটি গৈরিক উৎস ফুটিয়া উঠিল। কঞ্চুকির মনে হইল, কৌশল্যার প্রতি ইহা যে কেবল নিষ্ঠুর তিরস্কার করিবার উদ্দেশ্যেই জনকের এই উক্তি, তাহা নহে; নিষ্ঠুর পরিহাস বা মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গ করাই যে তাঁহার অভিপ্রায়, তাহাও নহে। কঞ্চুকির এই মামুলী কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টায় জনকের হৃদয়ের জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল, আত্মমর্য্যাদা দ্বিগুণভাবে ক্ষুণ্ণ হইল। একদিন সীতাপতি রামচন্দ্রও লক্ষ্মণকে বলিয়া-ছিলেন—"উৎপত্তিপরিপূতা" সীতার আবার শুদ্ধি কি" ? আর আজ সীতাপিতা জনকও গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

"আঃ কোঽয়মগ্নির্নাম অস্মৎপ্রসূতিপরিশোধনে"—সীতাই ত আমার মূর্ত্তিমতী শুদ্ধি, তার আবার শুদ্ধি কি! রাম ত একদিন অপমান করিয়াছে, আবার আজও পুনরায় অপমানিত হইলাম।

অরুন্ধতী জনকেরই বিশ্বাসের অভিব্যক্তি করিলেন। তারপর সীতার উদ্দেশ্যে একটি করুণ দীর্ঘনিশ্বাস নিরুদ্ধ নাসাপুট হইতে উত্থিত হইল। মহর্ষিবরণীয়া জগদ্বন্দ্যা অরুন্ধতী সীতাকে কি চক্ষুতে দেখিতেন, স্নেহের সঙ্গে কি গভীর শ্রদ্ধা তার উপর পোষণ করিতেন, তাহা প্রকাশ পাইল—

বৎসে,—শিশুর্বা শিষ্যা বা যদসি মম তত্তিষ্ঠতু তথা
বিশুদ্ধেরুৎকর্ষস্তয়ি তু মম ভক্তিং জনয়তি।

শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু ননু বন্দ্যাসি জগতাং
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ ॥

বৎসে, শিশুই হও, আর আমার শিষ্যাই হও—তুমি আমার যা, তুমি তাই থাক। কিন্তু তোমার পবিত্রতার উৎকর্ষ তোমার প্রতি আমার ভক্তি জন্মাইয়া দিতেছে। শিশুত্ব আর স্ত্রীত্ব যাহাই হউক, তথাপি তুমি জগতের বন্দনীয়া। গুণই পূজার প্রকৃত কারণ, লিঙ্গ (স্ত্রী পুরুষই লিঙ্গ) নহে, বয়সও নহে।

একদিকে জনকের অন্তঃস্তম্ভিত শোক, স্বত-উৎস্থত জ্বালার অভিব্যক্তি, আর অন্যদিকে অরুন্ধতীর শান্ত নিরূপক্রত স্নেহ, স্নিগ্ধ কোমল শ্রদ্ধার প্রকাশ। একদিকে, গৈরিক নদ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে, অপরদিকে, বননদী স্নিগ্ধ কোমল ছায়াখানি বুকে করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

কৌশল্যার হৃদয়ে ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ভ হইল—তখন কৌশল্যার মনে পড়িল, সেই প্রাণপ্রিয় পতি দশরথের কথা; সেই রাজর্ষির সহিত অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধুতা। স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল, সেই শিশুদের কোমল মুখকমলগুলি, সেই অতীতের মধুময়ী ছবি। তখন রাজরাণীর সেই কুসুম-সুকুমার হৃদয়ে বহুদিনের রুদ্ধ বেদনা জাগিয়া উঠিল। এই দারুণ দশা বিপর্য্যয় সহ্য করিতে না পারিয়া কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

রাজর্ষির উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য কোথায় ভাসিয়া গেল। হৃদয়ের সে উষ্ণ জ্বালা অকস্মাৎ যেন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। তখন রাজর্ষির চিন্তা-স্রোত অন্তর্খাতে বহিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ দশরথ কি ছিলেন? দ্বিতীয় হৃদয়, মূর্ত্তিমান্ আনন্দ, প্রাণধারণের ফল, না—আর কিছু ছিলেন? শরীর, জীবন—না—তাহা হইতেও প্রিয় কিছু ছিলেন? সেই দশরথের প্রাণপ্রিয়তমা, আমার সেই প্রিয়সখী কি এই! যাহাদের

ভালবাসার আমি সঙ্গী ছিলাম, আনন্দের অংশীভাগী ছিলাম, আর প্রণয় কোপেও যাহাদের মৃদুভর্ৎসনার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতাম,—সেই প্রিয়সখী কৌশল্যার প্রতি আমি কি নৃশংস ব্যবহারই না,—করিলাম।

কৌশল্যা ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিতে লাগিলেন—তাঁহার অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষুদুটি, তখন সীতার মুখপুণ্ডরীক-দর্শনাশায় ব্যাকুল; বাহুদুটী, সেই জ্যোৎস্না-কুমার অঙ্গলতিকার আলিঙ্গন-আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র। মহারাজ দশরথ বলিতেন "সীতা রঘুবংশের বধূ, কিন্তু জনকসম্বন্ধে সীতা আমাদের দুহিতা"।

সম্বন্ধের বীজ সীতা নাই; তথাপি দগ্ধ জীবন ত যায় না! বজ্রলেপ দিয়া কে যেন প্রাণকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; তাই আর প্রাণ নড়িতে চড়িতে চায় না। রোদনের স্রোত বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখিয়া অরুন্ধতী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং "পরিণাম ফল ভালই হইবে" কুলগুরুর এই আদেশটিও স্মরণপথে আনয়ন করিলেন। স্নেহ সর্ব্বদাই বৈফল্যই আশঙ্কা করে; তাই কৌশল্যা বলিলেন—

"ভগবতি, সীতাকে আবার পাইব? সে মনোরথ যে চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে" কৌশলার এই কথায় অরুন্ধতীর আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল। "শুভফল হইবে" বশিষ্টদেবের এই আদেশের উপর তাহার অবিশ্বাস! পতিব্রতা তেজস্বিনী নারী বশিষ্ট দেবের মত প তিদেবতার উপর রাজ্ঞীর এই অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ্য করিয়া যেন একটু উত্তেজিতা মত হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যিনি স্নেহের কোমলা মূর্ত্তি ছিলেন, এক্ষণে তিনি আবার ব্রহ্মণ্য জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়ী, সতীত্বের তেজে তেজস্বিনী। তেজস্বিনী ঋষিপত্নী তখন কৌশল্যাকে কহিলেন—

"তবে কি রাজপুত্রি, বশিষ্ঠ দেবের বাক্য মিথ্যা হইবে মনে করিতেছ? ক্ষত্রিয়ে, মনে অন্য প্রকার ভাবনা আনিয়ো না, তিনি যাহা বলিয়াছেন

তাহা অবশ্যই ঘটিবে। "সেই আবির্ভূত-ব্রহ্মজ্যোতি" ব্রাহ্মণের বাক্য কখন নিষ্ফল হয় না, তাঁহাদের বাক্যের উপর সিদ্ধি নিরন্তই বাস করে; সে ব্রাহ্মণেরা কখনও বিফল বাক্য উচ্চারণ করেন না। রামচন্দ্রই একদিন অষ্টাবক্র ঋষির "বীরপ্রসবা হও" (সীতার প্রতি) এই আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি" (১মাঙ্ক)।

নেপথ্যে কল কল রব উত্থিত হইল। বশিষ্ঠ জনকাদির আগমন-জন্ত বালকগণের আজ 'শিষ্টানধ্যায়'; কাজেই মনের আনন্দে বালকগণ আজি খেলাধুলায় মত্ত। কৌশল্যা শোকের মূর্ত্তি। বালকগণের আনন্দ-কোলাহল তাঁহারও চিত্তে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ফুটাইয়া দিল; তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সুলহ-সোখ্খং দাব বালত্তণং হোদি" বাল্যকালে চিন্তার উদ্বেগ নাই, শোক দুঃখের কোনও কারণ নাই, কাজেই শিশুদের সর্ব্বদাই আনন্দভাব।

সেই বালকগণের মধ্যে একটি বালকের মুখশ্রী সকলকার লোচনপটে ফুটিয়া উঠিল। সেই বালকই লব। তার সেই কুবলয়দল-স্নিগ্ধ ঘন শ্যামবর্ণ, সেই মনোরম কাকপক্ষ চূড়া, সেই সৌষ্ঠবপূর্ণ মুগ্ধ ললিত অঙ্গের মধ্যে কৌশল্যা রামভদ্রেরই শ্রী প্রত্যক্ষ করিলেন। জনকের মনে হইল, রঘুনন্দনই যেন শিশুরূপে দণ্ডায়মান। এ কে রে? নয়নের অমৃতাঞ্জন স্বরূপ এ বালকটী কে-রে? সপ্তর্ষি-বন্দিতা অরুন্ধতী ভাগীরথীর মুখে আগেই সমস্ত রহস্য অবগত ছিলেন। বৎসা সীতার যে দুইটী যমজ পুত্র, আর তাহারা যে বাল্মীকির আশ্রমে নীত, অরুন্ধতী তাহা আগেই শুনিয়াছিলেন। এই পুত্রটী যে, সেই যমজ পুত্রেরই অন্যতম, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

জনক,— এ বালক, এ ত ব্রাহ্মণ বালক নহে—এ যে ক্ষত্রিয়

ব্রহ্মচারী—নতুবা বাণপূর্ণ তূণীরদ্বয় পৃষ্ঠে থাকিবে কেন? এদিকে ভস্মলিপ্ত বক্ষ, পরিধেয় মৃগচর্ম, আবার বাহুতে কার্মুক শোভমান। অক্ষমালা বলয় ও অশ্বত্থদণ্ডের সঙ্গে "তূণীরদ্বয়সহ" শরাসনের মিলন বস্তুতই আশ্চর্য্যকর।

লবের 'বিনয়মসৃণ তেজ, মধুর-নম্র ব্যবহার, সুন্দর অভিবাদন প্রণালী দেখিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিলেন। অরুন্ধতী লবকে ত একেবারেই কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। শুধু যে তাঁহার কোলই ভরিয়া গেল, তাহা নহে; বহুদিনের মনোরথও সম্পূর্ণ হইল। অরুন্ধতী যে লবকেই সীতার পুত্র জানিয়া কোলে লইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার ত আনন্দ জন্মিবারই কথা। কিন্তু, কৌশল্যা ত লবকে সীতার পুত্র বলিয়া জানেন না; তথাপি যখন লবের নীলোৎপলশ্যাম অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, কলহংস-নিনাদবৎ মধুরগম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহারও মনে হইল, যেন শিশু "রামভদ্র" আসিয়া কোলে বসিয়া আছে। ভাল করিয়া লবের মুখখানির প্রতি দৃষ্টি করিয়া রামের মাতা দেখিতে পাইলেন যে, লবের মুখশ্রীতে যেন বধূ সীতারও মুখশ্রীর ছায়া ফুটিয়া রহিয়াছে। লব পিতার দৈহিকগঠন, কণ্ঠস্বর, ধীরোদাত্ত গতি ও অনুভাব-গাম্ভীর্য্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহার মুখশ্রী হইয়াছে মাতারই মুখের মত। শাস্ত্রেও বলে, মাতৃমুখ পুত্র সৌভাগ্যবান্।

স্ত্রীলোকের প্রকৃতিই এই। তাহারা শিশুদের মাতাপিতার কথাই অগ্রে জিজ্ঞাসা করে। কৌশল্যার হৃদয়ে আশার যে ক্ষীণরশ্মিটুকু জাগিবার উপক্রম করিয়াছে—প্রশ্নও তদনুরূপ হইবারই কথা, হইলও তাই। কৌশল্যা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মা আছেন, বাপকে মনে পড়ে?" হৃদয়ের অস্ফুট আশা আজ বাণীরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, নতুবা মার বেলায় 'আছেন'? আর বাপের বেলায় "মনে পড়ে"?—

এরূপ প্রশ্ন উঠে কেন? সীতার পুত্র, সীতা কাছেই আছে; রাম ত নিকটে থাকিবেন না। অবশ্য কৌশল্যা যে এই ভাবিয়াই ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহা না হইতে পারে।

লব কিছু জানে না—স্তন্য ত্যাগের পরই তাহারা মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাল্মীকি আশ্রমে প্রতিপালিত। সীতা তাহাদের মাতা, রামচন্দ্র তাহাদের পিতা—ইহা তাহারা জানে না। তাহারা জানে, তাহারা বাল্মীকির, "উত্তরও দিল তাই। কৌশল্যা সে উত্তর শুনিতে চাহেন না; মন ইহা চাহে না; তাই তিনি বলিলেন—"যাহা প্রকৃত বলিবার, তাহাই বল।" ভাবটী এই, বাল্মীকি ত আর বিবাহিত নহেন যে, তাঁহার পুত্র জন্মিবে।

রামচন্দ্র অযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী। সহধর্ম্মচারিণী ব্যতীত অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় না; তাই হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি পার্শ্বে রাখিয়া রাম অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবেন স্থির করিয়াছেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হওয়াই বিধি। লক্ষণের পুত্র চন্দ্রকেতু দিগ্বিজয়ে অশ্ব লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ঘটনাক্রমে বাল্মীকির আশ্রমে অশ্ব উপস্থিত। চন্দ্রকেতুও অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে উপনীত। জনকের সহিত কথোপকথনে লব মহর্ষি বাল্মিকীর রচিত রামায়ণের কথা পাড়িল এবং জানাইল—"প্রাপ্তপ্রসববেদনা সীতার বনবাস পর্য্যন্তই প্রকাশিত হইয়াছে।" বাল্মীকি-রচিত সংস্কৃত রামায়ণে, পাঁচমাস গর্ভাবস্থায়, বাল্মীকির আশ্রমের সম্মুখেই লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সীতা বিসর্জ্জিতা হন। কিন্তু ভবভূতি সীতাকে পূর্ণগর্ভাবস্থায় গভীর অরণ্যে ভাগীরথীতীরে বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, [এ সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা প্রথমাঙ্ক সমালোচনায় আগেই করিয়াছি।] এবং রামায়ণের কিয়দংশ লইয়া যে একখানি নাটকও প্রণীত হইয়াছে; আর সেই নাটকখানি অভিনয়ার্থ

নাট্যগুরু ভরতঋষির আশ্রয়ে প্রেরণও করা হইয়াছে। নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশ সেই নাটকখানি পৌঁছিয়া দিবার ভার লইয়া সশস্ত্রে যাত্রাও করিয়াছে।"

ভ্রাতার কথা শুনিয়া কৌশল্যা যেন একটু হতাশ, একটু মুহ্যমান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ভাইও আছে!" "ভ্রাতা আছে"—তবে ত সীতার পুত্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তারপর যখন যমজ ভ্রাতার কথা শুনিলেন, তখন যেন আবার আশ্বস্তা হইয়া উঠিলেন।

মিথ্যা জনরবে উদ্বিগ্ন হইয়া রামচন্দ্র পূর্ণগর্ভা সীতাকে অরণ্যে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—লবের মুখে এই কথা শুনিয়া কৌশল্যা কাঁদিয়া উঠিলেন। পিতা জনক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"উঃ—সেই নিদারুণ পরিত্যাগের অপমান, তার উপর প্রসবের ব্যথা; আর চারিদিকে হিংস্র বন্যজন্তুর কোলাহল! বৎসা সীতা ভয়ে ভীত হইয়া কতবারই না—আমাকে "রক্ষা কর" বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে? হা বৎসে,

নূনং ত্বয়া পরিভবঞ্চ নবঞ্চ ঘোরং তাঞ্চ ব্যথাং প্রসবকালকৃতামবাপ্য।
ক্রব্যাদগণেষু পরিতঃ পরিবারয়ৎসু সন্ত্রস্তয়া শরণমিত্যসকৃৎস্মৃতোঽস্মি" ॥

জনকের স্নেহময় চক্ষুর উপর সীতার সেই অশরণ অবস্থার ছবি ফুটিয়া উঠিল। অরুন্ধতী, কৌশল্যা এবং বিশেষতঃ বালক লবের সম্মুখে রাজর্ষির মাথা কাটা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে পৌরজনের কুমর্য্যাদা আর রামের অবিমৃষ্যকারিতাও মনে পড়িল। উঃ—এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই সীতার এই নিন্দিত নির্ব্বাসন, এই নিদারুণ দশা বিপর্য্যয়—চিন্তা করিতে করিতে জনকের অন্তর উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; রুদ্ধ কোপানল অবসর পাইয়া আজি অগ্নিমুখে বাহির হইতে চাহে; "অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথা" অভিশাপের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। কৌশল্যা

দেখিলেন, সর্ব্বনাশ, এখনই বুঝি অযোধ্যা দগ্ধ হইয়া যায়, রাজপরিবারবর্গ অভিশপ্ত হইয়া উৎসন্ন প্রাপ্ত হয়, রঘুকুল ছারখারে যায়। রাজমাতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন "ভগবতি, ক্রুদ্ধ রাজর্ষিকে প্রসন্ন করুন।

অরুন্ধতী দেখিলেন—শম-প্রধান তপোবনে আজি দাহাত্মক, গূঢ় তেজ জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে; তপস্যাবর্দ্ধিত ক্ষত্রিয়তেজ আজি ভয়ানকরূপে দেখা দিয়াছে। তখন অরুন্ধতী, বৎস রামচন্দ্রের করুণদুর্ব্বল দেহচ্ছবি ক্রুদ্ধ রাজর্ষির সম্মুখে ধরিলেন; প্রতিপাল্য হতভাগ্য পৌরজনবর্গের প্রকৃত অবস্থা মনে করাইয়া দিলেন। তখনই জনকের সেই দারুণ কোপানল শান্ত হইয়া আসিল; পুত্রস্থানীয় রামচন্দ্রের উপর একটি করুণ সমবেদনা জাগিয়া উঠিল। "ভূয়িষ্ঠদ্বিজ-বালবৃদ্ধবিকল-স্ত্রৈণশ্চ পৌরো জনঃ" বলিয়া রোষপ্রকাশ নিষ্ফলবোধে রাজর্ষি শান্ত হইলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণবালকগণ নূতন জীবটিকে দেখাইবার জন্য লবকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। লব শাস্ত্রজ্ঞানে বুঝিল, অশ্বমেধ যজ্ঞেরই অশ্ব।

"বিশ্ববিজয়িনাং উর্জ্জস্বলঃ সর্ব্বক্ষত্রিয়-পরিভাবী মহান্ উৎকর্ষনিকর্ষঃ" লবের ব্রহ্মচর্য্য-শান্ত ক্ষত্রিয়-তেজঃ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তারপর যখন শুনিল

জয়বর্ষঃ পতাকেয়মথবা বীরঘোষণা।
সপ্তলোকৈকবীরস্য দশকণ্ঠকুলদ্বিষঃ॥

এই ক্রোধোদ্দীপক অক্ষর, এই রাজসিক বাণী লবের ক্ষত্রিয় তেজে প্রচণ্ড আঘাত করিল। "কি, পৃথিবী কি নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছে"—বলিয়া লব অন্তরের মধ্যে একটি ব্যথা অনুভব করিলেন—

"ন তেজস্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাং প্রসহতে"

"মহারাজ রামচন্দ্রের নিকট আবার ক্ষত্রিয় কে?" রাজপুরুষের এই দর্পিত বাণী শুনিয়া লব তখন রামচন্দ্রের জয়বৈজয়ন্তী, সেই উৎকর্ষ ও নিকর্ষস্বরূপ অশ্বটি গ্রহণ করিলেন। তখন লবের কথামত ব্রাহ্মণবালকেরা অশ্বকে তপোবনের মধ্যে তাড়াইয়া লইয়া গেল। "সক্রোধদর্প" রাজপুরুষবর্গের দীপ্যমান অস্ত্রশ্রেণী ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। লবেরও উৎকট-কোটিক কোদণ্ড হইতে ঘন-ঘর্ঘর ঘোর উত্থিত হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার উপক্রম হইল!

পঞ্চমাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্কের যবনিকা উঠিল। চন্দ্রকেতু রথে চড়িয়া রণসাজে সাজিয়া আসিল। সঙ্গে মাত্র সারথি সুমন্ত্র। চন্দ্রকেতু বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল—তাহার সৈন্যগণের উপর অনবরত শরতুষার বর্ষণ হইতেছে। কোপে ঈষৎ রঞ্জিতমুখ—ও কে বীর-শিশু, শরাসনে টঙ্কার দিতেছে। বীরের মন বিস্ময়ে আনন্দে সম্ভ্রমে ভরিয়া গেল। ও যে মুনিবালক, আশ্চর্য্য! এ কি কৌতুক, আর্য্য সুমন্ত্র!

দশরথের সারথি সুমন্ত্র চন্দ্রকেতুর সম্মানের পাত্র, তাই এই "আর্য্য" সম্বোধন। লবের পানে দৃষ্টি পড়িবামাত্র সুমন্ত্র বিস্মিত হইল। মনে হইল যেন, শিশুরূপে রঘুনন্দন সম্মুখে দণ্ডায়মান। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে রামভদ্র যখন রাক্ষসগণের উপর শরবৃষ্টি করিয়াছিলেন—সেই ছবিটী সুমন্ত্রের মনে পড়িল। সেই নীলোৎপল শ্যামবর্ণ, সেই অনুভাব-গম্ভীর ভাব, সেই মনোরম কাকপক্ষচূড়া মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিল, রামের পুত্র, লক্ষ্মণের পুত্র—উভয়েই রাজর্ষি জনকের দৌহিত্র। পরস্পরের আকারগত সাদৃশ্য বিশেষরূপেই বিদ্যমান।

একদিকে লব একাকী। অন্যদিকে শত শত সৈনিক দণ্ডায়মান। একের বিরুদ্ধে এত লোকের অভ্যুত্থান!

চন্দ্রকেতুর বড় লজ্জা হইল। বীর বীরত্বের মূল্য বুঝে। যুদ্ধ যে ক্ষত্রধর্ম্মের অলামাত্র, প্রকৃত যোদ্ধার যুদ্ধ যে মানুষ মারার যন্ত্র মাত্র নহে—তাহা লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধেই বেশ বোঝা যায়। বালকের যুদ্ধে আজ বীর সৈনিকগণের পরাজয়, ততোধিক লজ্জা তাহাদের ঘৃণাকর প্রত্যা-

বর্জন! বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, লজ্জার উপর লজ্জা, সম্ভ্রমের উপর সম্ভ্রম। চন্দ্রকেতুর রথও মুহূর্ত মধ্যে লবের সম্মুখে উপস্থিত।

চন্দ্রকেতু তখন লবকে ডাকিয়া বলিল—

ভো ভো লব মহাবাহো কিমেভিস্তব সৈনিকৈঃ।

এষোঽহমেহি মামেব তেজস্তেজসি শাম্যতু॥

"ওহে লব, ক্ষুদ্র সৈনিকগণের সহিত আর তোমার যুদ্ধে কাজ কি? এই আমি আছি, আমার নিকট এস, তেজ তেজেতেই শান্ত হউক।" এই বিনয়মসৃণ তেজ, এই শান্ত-মধুর ধীর ভাব চন্দ্রকেতুর চরিত্রটি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃত ক্ষত্রিয়বীরের বীরগর্ব আজ বাণীরূপে বহিঃপ্রকাশ লাভ হইয়াছে। চন্দ্রকেতুর সদয়োদ্ধত আহ্বানে লব সৈনিকগণকে ত্যাগ করিয়া তাহারই লক্ষ্যে ধাবমান হইল। যেন গর্বিত সিংহশিশু মেঘনিনাদ-শ্রবণে হস্তির দল ত্যাগ করিয়া মেঘের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। পদক্ষেপ যেমন ত্বরিত, তেমনই উদ্ধত।

"সাধু, রাজপুত্র, সাধু, ইক্ষ্বাকুবংশের যোগ্য তুমি, অপেক্ষা কর—এই আমি এই যাইতেছি" বলিয়া লব যেমন ফিরিবে, অমনই পশ্চাতে ভীষণ কোলাহল। ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব রক্ষা যে করিতে জানে, সে সাধুবাদের যোগ্য। পশ্চাতে কোলাহল শুনিয়া—"ধিক্ মূর্খ, তোমাদের এই ঘন-তুমুল রণকোলাহল এখনই শান্ত করিতেছি" বলিয়া যেমন লব সৈন্যগণের দিকে ফিরিতে যাইবে, অমনিই শুনিল যে, চন্দ্রকেতু বলিতেছে—

অত্যদ্ভুতাদসি গুণাতিশয়াৎ প্রিয়ো মে

তস্মাৎ সখা ত্বমসি যন্মম তৎ তবৈব।

তৎ কিং নিজে পরিজনে কদনং করোষি

নন্বেষ দর্পনিকষস্তব চন্দ্রকেতুঃ॥

কুমার লব, এই অতি-অদ্ভুত গুণের আতিশয্যে তুমি প্রিয় হইয়াছ।

একণে তুমি যেমন আমার সখা, আমি তেমনি তোমার সখা; আমার পরিজনও তোমারই পরিজন, তবে নিজ পরিজন ক্ষয় করিয়া ফল কি? তোমার বীরদর্পের কষ্টিপাথর আমি রহিয়াছি, বীরত্বের প্রকৃত পরীক্ষা আমাতেই হউক।

অসম যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। লোভী দুর্যোধন দ্বৈপায়নহ্রদে উরুভঙ্গের দিন ভীমকেই স্বেচ্ছায় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বরণ করিয়া লয়। পাপী জরাসন্ধও কৃষ্ণার্জ্জুন অপেক্ষা ভীমকেই বলবান্ দেখিয়া তাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। চন্দ্রকেতু উদার স্নেহময় কিন্তু সে ক্ষত্রিয়বীর; ক্ষত্রোচিত তেজ, বীরত্ব, অভিমান তাহার অতীব প্রবল। "নন্বেষ দর্শনিকবস্তব চন্দ্রকেতুঃ" কথাটী প্রসন্ন অথচ কর্কশ; লবের নিকট বড় মধুর, বড় তীক্ষ্ণ লাগিল। বড় হর্ষে, বড় সম্ভ্রমে লব যেমন চন্দ্রকেতুর দিকে গতি ফিরাইবে, অমনই আবার সৈন্যদলের ঘন কলকলধ্বনি শোনা গেল।

চন্দ্রকেতু প্রকৃতই মহানুভব বীর। একের বিরুদ্ধে অনেকের আক্রমণ তাহার প্রাণে সহিবে কেন? তখন সেনানীদের "ধিক্ মূর্খ" বলিয়া চন্দ্রকেতুও গালি দিল। লব চন্দ্রকেতুরই ত ভাই; সে সৈন্য-দিগকে আক্রমণ হইতে বিরত করার আদেশকে তাহার উপর করুণা ও সহানুভূতির নিদর্শন বলিয়া বুঝিল; তাই লবের মনে একটী ব্যথার অনুভব হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট এ দয়া, এ সহানুভূতি সে চাহে না। তৎক্ষণাৎ লব ধ্যানযোগে উদ্ভূত জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা সৈন্যদিগকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। সে সৈন্য-কোলাহল মুহূর্ত্তের মধ্যেই থামিয়া গেল। রণক্ষেত্র তখন চিত্রার্পিতবৎ নিঃস্পন্দ। এ এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার!

প্রথমাঙ্কে চিত্রদর্শন-প্রস্তাবে রামচন্দ্র সীতাকে বর দান করেন;

আমার এই জৃম্ভকাস্ত্র-বিদ্যা তোমার গর্ভস্থ সন্তানে সংক্রমিত হউক।" মন্ত্রশক্তির মত জৃম্ভকাস্ত্র-বিদ্যা তাই জন্মিবামাত্রই লবের অধিগত হইল। জৃম্ভকাস্ত্রবিদ্যা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দান, রামের আত্মত্যাগের পুরস্কার। এ অস্ত্র যেন অন্ধকার ও বিদ্যুৎপুঞ্জের সন্নিপাত। এ একপ্রকার বৈদ্যুতিক ব্যাপার। এ অস্ত্রের তমোময় তেজে চক্ষু প্রথমে মুদ্রিত হইয়া আইসে, চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, পরক্ষণেই দারুণ বাথা অনুভব করে। তার পর নিস্পন্দ অবস্থা, চিত্রলিখিত দশাপ্রাপ্তি।

লব ও চন্দ্রকেতু পরস্পরে সম্মুখীন হইল। তুল্য রূপ, সমান বয়স, মনোবৃত্তিও এক জাতীয়। পিতৃ-সম্বন্ধে এবং মাতৃসম্বন্ধে দুজনের দেহে একই রক্ত বহমান। লব চন্দ্রকেতু পরস্পর পরস্পরের নিকট বড়ই প্রিয়-দর্শন বলিয়া বোধ হইল। স্নেহ ও অনুরাগের সহিত উভয়ে উভয়কে দেখিল। এ যেন অহেতুক মিলন, এ যেন "জন্মান্তর-নিবিড়বন্ধ পরিচয়," এ যেন অজ্ঞাত রক্তসম্বন্ধের প্রভাব। ইহা জীবগত ধর্ম যে, কাহাকে দেখিবামাত্র কাহারও হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার হয়। কবি এইরূপ অনুরাগের নাম দিয়াছেন তারামৈত্রক বা চক্ষুরাগ। তারায় তারায় মিল, রাশিচক্রে মিল, গ্রহনক্ষত্রে মিল যে, ভালবাসা ও প্রীতিসঞ্চারের হেতু— ইহা আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা।

"অহেতুঃ পক্ষপাতো যস্তস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া।
স হি স্নেহাত্মকস্তন্তুরন্তর্মর্মাণি সীব্যতি॥

কারণ বিনা যে অনুরাগের সঞ্চার হয়, তাহার কখন উচ্ছেদ দেখা যায় না। সেই স্নেহময় সূত্রটী হৃদয়কে এক সঙ্গে জুড়িয়া দেয়।

চন্দ্রকেতু ও লবের হৃদয়ে যুগপৎ একই ভাবের উদয় দেখা দিল। উভয়েই ভাবিল—আলিঙ্গনাশায় যে অঙ্গে পুলক ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে চিক্কণ কমনীয় অঙ্গে কি করিয়া অস্ত্রক্ষেপ করা যাইবে? উপায় কি?

রণক্ষেত্রে আসিয়া ত রণবিমুখ হওয়া যায় না। বীর হইয়া বীরধর্ম পালন না করাও সম্ভব হয় না। কি কঠোর স্নেহহীন বীরের আচার।

"বীরাণাং সময়ো হি দারুণরসো স্নেহক্রমো বাধতে"

রথারূঢ় চন্দ্রকেতু লবকে পাদচারী দেখিয়া "ইহা ক্ষত্রিয়ধর্ম নহে", বুঝিয়া রথ হইতে অবতরণ করিল। লব পাদচারী, নিজে রথারূঢ়—এ যুদ্ধ ত ন্যায়যুদ্ধ নহে। আর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমক্ষেত্রে দাঁড়াইলে নিজেরই সম্মান। কিন্তু চন্দ্রকেতু এই অবতরণকে বীরের পূজা বলিয়া মনে করিল। রঘুকুলের মর্য্যাদাভিজ্ঞ সুমন্ত্র চন্দ্রকেতুর এ সাহসের কার্য্যটিকে বারণ করিতে পারিল না। যদিও চন্দ্রকেতু বালক, তাহার জীবনের শুভাশুভ সুমন্ত্রের উপর নির্ভর, তথাপি সুমন্ত্র কর্ত্তব্যের নিকট স্নেহের বলি দিল। ধন্য সুমন্ত্র, ধন্য চন্দ্রকেতু!

লবও বীর, রামের পুত্র। সে রক্তের গুণ কোথায় যাইবে? তাই লব চন্দ্রকেতুকে রথ হইতে অবতরণ করিতে বারণই করিল। অথচ নিজে চন্দ্রকেতু-দত্ত অন্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিল না। ভিতরে প্রচণ্ড গর্ব্ব, তথাপি তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া বিনয়ের সহিত রথারোহণ-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিল।

"কো বিচারঃ স্বেষু উপকরণেষু কিন্তু অরণ্যসদো বয়মনভ্যস্তরথচর্চ্চাঃ"

"অবশ্য রথারোহণে আমার কোন আপত্তি নাই। অরণ্যচারী আমি—রথারোহণে আমার অভ্যাস নাই।" দর্প সৌজন্যের কি বিচিত্র মিলন!

লব-চন্দ্রকেতুর ব্যাপারটি আগাগোড়া বিচিত্ররসের মিশ্রণে একপ্রকার উপভোগ্যই হইয়াছে। দুজনের দৃষ্টি স্নেহপয়োধারায় অভিষিক্ত, বাহু কিন্তু জয়াকাঙ্ক্ষায় ধনুর্ব্বাণ আকর্ষণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সুমন্ত্র একবার ভাবিল, লব কি রামচন্দ্রের পুত্র, সীতার গর্ভজাত? হৃদয় যে ইহাই ভাবিতে চাহে। আবার পরক্ষণে বিবেক আসিয়া সে ভাবনা দূর করিয়া দিল। যে সন্তান

বহুদিন উন্মূলিতা হইয়া গিয়াছে,তাহার আর পুনঃপ্রসবের আশা কোথায় ? হৃদয় যাহা ভাবিতে চাহে, যুক্তি অনেক সময়ে তার বিপক্ষে যায়। যদিও সুমন্ত্র বলিল "লবের এই দর্পসৌজন্যের অনুরূপ আচরণ দেখিলে রামভদ্রের হৃদয় নিশ্চয়ই স্নেহে গলিয়া যাইত"। তথাপি বৃদ্ধ সুমন্ত্রের হৃদয়ের এক কোণে "রামভদ্রের হৃদয় স্নেহে গলিয়া যাওয়ার" অপর একটী কারণও ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

লব তখন নিজ উদার হৃদয়ের এবং ঋষি-কুমারোচিত প্রশান্ত ভাবের দিক্ দিয়া বিচার করিয়া লজ্জিত হইল। সেই রামায়ণকথা-নায়ক সুজন রাজর্ষি রামচন্দ্র, তাঁহার অশ্ব ধরিয়াছি মনে করিয়া ব্যথিতও হইল ; তাই সুমন্ত্রকে কহিল "আর্য্য, আমরা সেই রাজর্ষির অশ্বমেধযজ্ঞ পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞীয়াশ্ব ধরি নাই। শৌর্য্য সৌজন্যের আদর্শ অযোধ্যানাথের উপর আমরা কোনরূপ দ্বেষ ভাবও পোষণ করি না। তবে অশ্বরক্ষকের ক্ষত্রিয়-অবমাননাকরী উদ্ধত বাণী—

অয়মশ্বঃ পতাকেয়মথবা বীরঘোষণা।
সপ্তলোকৈকবীরস্য দশকণ্ঠকুলদ্বিষঃ ॥

আমাদের চিত্তে বিকার জন্মাইয়া দিয়াছে—তাই অশ্ব ধরিয়াছি। এই গর্ব্বিত বাণী কোন্ বীর সহ্য করিতে পারে ?"

লবের কথা শুনিয়া চন্দ্রকেতুও হাসিতে হাসিতে বলিল—সে হাসির মধ্যে ব্যঙ্গের সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। "জ্যেষ্ঠতাতের প্রভাবোৎকর্ষের প্রতি লবের এ অমর্ষ মাত্র" রামচন্দ্রের প্রভাব যতই উৎকর্ষতা লাভ করুক না কেন, তাহাতে লবের হৃদয়ে অমর্ষ জ্বালা অন্যায় ; বীরের সৌভাগ্য-গর্ব্বে এ অসহিষ্ণুতা, উদারতার পরিচায়ক নহে—তাই চন্দ্রকেতু ঈষৎ বিরক্ত, অসন্তুষ্ট এবং ব্যথাপ্রাপ্ত হইল।

"ন তেজস্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাং প্রসহতে" লবের উক্তি। তেজস্বী

কখন অপরের তেজ সহ্য করিতে পারে না—ইহা সহজ প্রকৃতি। কাজেই লবের হৃদয়ে এ অসহিষ্ণুতা জন্মিলেও তাহা কিছুতে অন্যায়ও হইত না। লব কিন্তু আপনার হৃদয়ের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া রামচন্দ্রের উপর যে তাহার কোন অমর্ষ আছে, তাহা বুঝিতে পারিল না। লবের ধারণা, অশ্বরক্ষকের গর্ব্বিত বাণীই এই যুদ্ধের মূল কারণ। স্বভাবতঃ দান্ত, সুজন রামচন্দ্রও গর্ব্বিত নন, জনসাধারণের উপর ত তাঁহার কোনদিন ঔদ্ধত্যও প্রকাশ পায় নাই—তবে তাঁহার সৈনিকেরা এ উদ্ধত বাণী প্রচার করে কেন? এ ত রামচন্দ্রের প্রকৃতির যোগ্য নহে। যে বাণী সর্ব্ববিধ বৈরভাবের পোষক, যাহা দেশের অলক্ষ্মীস্বরূপা, তাহা যে রাক্ষসী বাণী। ঋষিগণ এ রাক্ষসী বাণীর নিন্দাই করিয়া থাকেন। লব যদিও ক্ষত্রিয়-কুমার, তথাপি সে শান্তিময় তপোবনে বাস করিয়া, মহর্ষির নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া আর্য-সংস্কারপূত হইয়াছে, সে সকল ক্ষত্রিয়-পরিভাবিনী বাণীকে অশুভকরী, অলক্ষ্মী ও সর্ব্বনাশিনী রাক্ষসী বলিয়া কেন মনে না করিবে?

লব যখন দেখিল,—"এই অশ্ব জয়পতাকা" এই রাক্ষসী বাণীই যুদ্ধের কারণ—তখন তাহা অমর্ষ হউক বা নাই হউক—তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাই চন্দ্রকেতুর কথার খোঁচাটি অনেকক্ষণ ধরিয়াই লবের মর্ম্মে বিঁধিয়া রহিল। তাই লব চন্দ্রকেতুর কথায় উত্তর দিল "যদি আমার রামচন্দ্রের প্রভাবোৎকর্ষের প্রতি অমর্ষই হইয়া থাকে, তাহাতে কোন দোষের কথা নাই। ক্ষাত্র-ধর্ম্ম ত আর ব্যক্তি-বিশেষেই আবদ্ধ নহে।" বাস্তবিকই বীর-গর্ব্ব, কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে যে, অপর কাহারও তাহাতে অধিকার থাকিবে না।

সুমন্ত্র স্থির ধীর, লবের প্রতি স্নেহ-বিশিষ্টও বটে। এদিকে সে প্রভুভক্ত, দশরথপুত্র অযোধ্যানাথ রামচন্দ্রের উপর তাহার অগাধ শ্রদ্ধা; লবের

এ দর্পিত বাণী তাহার প্রাণে একটী জালার সৃষ্টি করিল। বালকের এই অনধিকার চর্চ্চায়, রামচন্দ্রের প্রতি সাবজ্ঞ ব্যবহারে, সুমন্ত্র বিরক্তও হইল। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়, আবার বিক্ষুব্ধও হইয়া থাকে। সুমন্ত্রেরও তাহাই হইল। ক্ষুব্ধচিত্তে লবের কথায় তীক্ষ্ণ উত্তর না দিয়াও পারিল না—

"তুমি সে ইক্ষ্বাকু-কুলাবতংস রামচন্দ্রকে জান না, অতএব তাঁহার বিষয়ে এ অতিপ্রসঙ্গ হইতে বিরত হও। সৈনিকগণকে জয় করিয়া বীর্য্যবত্তা দেখাইয়াছ বলিয়া সেই জামদগ্ন্য-বিজেতার উপর তোমার কটাক্ষ করা সাজে না।" রামচন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক এ উক্তি লবের পক্ষে অতিপ্রসঙ্গ বলিয়াই সুমন্ত্র তিরস্কার করিল।

লব সাধারণভাবে যাহা বলিল, তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে রামচন্দ্রের কোন রূপ অসম্মান করা হয় নাই। সুমন্ত্র কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবেই লবকে আঘাত না করিয়া পারিল না। লব বীর, ইক্ষ্বাকু-রক্ত তাঁহার ধমনীতে বহমান, সে সহ্য করিবে কেন? কথায় কথা বাড়িয়া যায়, স্ফুলিঙ্গে ফুৎকার দিলে তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। লবও ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উপহাসের সহিত সুমন্ত্রকে কহিল—

ব্রাহ্মণের বাক্যে বল, ক্ষত্রিয়ের বাহুতে বল—ইহার প্রসিদ্ধি আছে। অতএব শাস্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মণ জামদগ্ন্যের বিজেতা বলিয়া রামচন্দ্রের আর প্রশংসা কি?"

চন্দ্রকেতুর আর সহ্য হইল না। জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি এত বড় অবজ্ঞা-সূচক কথা সে কখন শোনে নাই। লক্ষণপুত্র এ তীব্র আঘাতে আহত-প্রায় হইয়া উঠিল। কথোপকথন আর চলে না। লবকে এ প্রকাশ্য আক্রমণের উত্তর দেওয়া চন্দ্রকেতুর পক্ষে অসম্ভব। বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে সুমন্ত্রই তাই সুমন্ত্রকেই বারণ করিল। অবশ্য পরোক্ষভাবে লবের আক্রমণ প্রতিহত করাই হইল।

আর্য্য, আর্য্য,—কৃতমুত্তরোত্তরেণ—

কোঽপ্যেষ সম্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারঃ

শ্লাঘ্যো ন যস্ত ভগবান্ ভৃগুনন্দনোঽপি।

পর্য্যাপ্ত সপ্তভুবনাভয়দক্ষিণানি

পুণ্যানি তাতচরিতানি চ যো ন বেদ॥

আর্য্য, আর কথা কাটাকাটির প্রয়োজন নাই। কে ইনি নূতন পুরুষাবতার হইয়া আসিয়াছেন, যাহার নিকট ভগবান ভৃগুনন্দনও শ্লাঘ্য বিবেচিত হন না। সপ্ত ভুবনের অভয়দাতা শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যময় চরিতও তুচ্ছ প্রতীত হয়।

স্ত্রীহত্যার যাঁহার বীরত্ব, বালিবধে যাঁহার কৌশল, তাঁহার বীরত্বকৌশল কে না জানে? লব যখন রামচন্দ্রের প্রতি এই তীব্র বিদ্রূপোক্তি করিল—তখন চন্দ্রকেতু দণ্ডাহত বিষধরের মত গর্জ্জাইতে লাগিল "আঃ তাতাপবাদ-ভিন্নমর্য্যাদ অতি হি নাম প্রগল্ভসে" বলিয়া নিদারুণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল; স্বভাবতঃ আরক্তিম চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। লবের এ প্রগল্ভতা উত্তেজিত হৃদয়ের ফল বলিয়া আমরা ধরিয়া লইয়াছি। নচেৎ লবচরিত্রের মহত্ব একটু ক্ষুণ্ণ হইত।

তখন দুই মহাবীর সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য বিমর্দ্দনক্ষমা ভূমিতে অবতরণ করিল। তখন প্রিয়দর্শন, কোমলপ্রকৃতি লব ও চন্দ্রকেতুকে রুদ্রদর্শন এবং কঠোর বলিয়া বোধ হইল।

সংস্কৃত নাটকে নেপথ্যেই যুদ্ধ হওয়ার প্রথা। যুদ্ধ বল, হত্যা বল, এ সকল রঙ্গমঞ্চে দেখান নিষিদ্ধ। বর্ণনা দ্বারা যুদ্ধের ছবিটি হৃদয়ে ফুটাইয়া তোলাই কবির কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধব্যাপারটি ষষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী সংবাদে বিবৃত হইবে।

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথমেই বিষ্কম্ভক। আকাশপথে বিদ্যাধর-যুগলের আবির্ভাব। লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিবার জন্য তাঁহারা উজ্জ্বল বিমানে চড়িয়া অন্তরীক্ষে উপস্থিত। একদিকে দেবতা-বৃন্দ গম্ভীর-মাংসল দেব-দুন্দুভি ধ্বনি দ্বারা সমররাগ বর্দ্ধনার্থ অগ্রসর। অপরদিকে—দেবীগণ "মণিমুকুল মকরন্দ-সুন্দর" পুষ্পবর্ষণ দ্বারা মাঙ্গল্য-বিধানার্থ সমুৎসুক।

লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ বস্তুতই অদ্ভুত। এ যুদ্ধ-কৌশলের নিকট বিংশ-শতাব্দীর যুদ্ধকৌশলও হার মানে। চন্দ্রকেতু আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিল, বিদ্যুচ্ছটায় সহসা আকাশ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া গেল—তাহার ঊর্দ্ধপ্রসৃত শিখা দেবদেবীগণের বস্ত্রাঞ্চল রক্তচন্দনলিপ্ত করিয়া দিল। কি তাহার প্রদীপ্ত রশ্মি! বিশ্বকর্ম্মার শাণযন্ত্রে আরূঢ় সহস্রকর যেন করজাল বিস্তার করিতেছে। আগ্নেয়াস্ত্রের বিস্ফুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জ্বালা-সন্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া দেবদেবীগণ স্ব স্ব রথ লইয়া ঊর্দ্ধদিকে বিশৃঙ্খল-ভাবে পলাইয়া যাইতেছে।

বিদ্যাধর দেখিল, তাহার প্রিয়ার কুসুমকোমল অঙ্গ ঝলসিয়া যায়; তখন অতিক্রুত, নিবিড় বাহু-আলিঙ্গনে সেই অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া স্থান ত্যাগ করিল। বিদ্যাধরী "মৌক্তিকসর-শীতল" মসৃণ-মাংসল নাথদেহস্পর্শে সুখমুকুলিতলোচনা হইয়া সে সন্তাপ নিমেষমধ্যে ভুলিয়া গেল।

এইবার লবের বারুণাস্ত্র সন্ধান। "ময়ূরকণ্ঠ-শ্যামল" মেঘদল আসিয়া সমস্ত নভস্তল মসী-কৃষ্ণ করিয়া দিল। এমন অবিরল প্রচুর বারিধারা বর্ষিতে লাগিল যে, আগ্নেয়াস্ত্র-জ্বালা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল।

উঃ, সে কি বিরাট অন্ধকার! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন সেই অন্ধকার-পুরের মধ্যে ডুবিয়া আছে। কালকণ্ঠের ব্যাদিত বিশাল মুখগহ্বরে প্রাণিগণ যেন নিশ্চেষ্টমান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সহসা রণস্থল আলোকময় হইয়া উঠিল। বিদ্যুতালোকে দেখা গেল, রামায়ণ-কথা নায়ক রামচন্দ্র বিমান লইয়া এই লব-চন্দ্রকেতুর মধ্যস্থলে উপস্থিত। দুই মহাবীরের উদ্যত-অস্ত্র নিমেষে থামিয়া গেল। পঞ্চবটী হইতে ফিরিবার পথে শিশুদ্বয়ের যুদ্ধ শুনিয়া রামচন্দ্র শান্তিদেবতার মত বিমান হইতে অবতরণ করিলেন।

"দিনকর-কুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো
সরভসমেহি দৃঢ়ং পরিষজস্ব"

"সূর্য্যকুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো, এস, সত্বর আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর! তোমার তুহিনশীতল অঙ্গস্পর্শে আমার হৃদয়ের তাপ শান্ত হইয়া যাউক। এই বলিয়া রামচন্দ্র পুত্রোপম চন্দ্রকেতুকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। তারপরই লবের দিকে তাঁর চক্ষু পড়িল। বৎস চন্দ্রকেতুর বয়স্য, এই বালকটীর গম্ভীরাকৃতি তাহাকে মুগ্ধ করিল। মনে হইল, লোকপালনের জন্য ধনুর্ব্বেদ যেন শরীরী হইয়া উপস্থিত; বেদরূপ রত্নাগার রক্ষার জন্য ক্ষাত্রধর্ম যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দণ্ডায়মান। এ যে বীর্য্য শৌর্য্যের সমবায়, দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের সমষ্টি! জগতের পুণ্যনির্ম্মাণ-রাশি যেন সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে!

লবেরও কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সে বিরোধভাব, সে ঔদ্ধত্য দূরে গিয়া তাহার স্থানে মুহূর্ত্তের মধ্যে এক "প্রীতিঘন" রসের আবির্ভাব দেখা গেল, বীরের গর্ব্বোন্নত শির কি এক যাদুমন্ত্রে সহসা বিনয়াবনত হইল— আশ্বাস, স্নেহ এবং ভক্তির একমাত্র অবলম্বন—প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ প্রসাদ—এই কি মহাপুরুষ রামচন্দ্র? কি পুণ্যানুভব-দর্শন!

চন্দ্রের উদয় হইলে চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয়, লবের মুখচন্দ্রদর্শনে রামচন্দ্রেরও মন বিগলিত হইল। রাম আর থাকিতে পারিলেন না; লবকে সস্নেহালিঙ্গন করিলেন। সে "পদ্মদল-পীন মসৃণসুকুমার" সে "চন্দ্রচন্দননিষ্যন্দ" অঙ্গস্পর্শ রামকে এক অজ্ঞেয় আনন্দ অনুভূত করাইল। স্বজাত পুত্রস্নেহই যে এই "নির্বৃতি-ঘন" রসের সঞ্চারক, এই অজ্ঞেয় আনন্দের জনক—রাম ইহা কিরূপে বুঝিবেন? তিনি ইহাকে নিমিত্ত-নিরপেক্ষ অহেতুক স্নেহ-প্রবৃত্তির খেলা বলিয়া ধরিয়া লইলেন।

রামচন্দ্রের এই অকারণ স্নেহ দেখিয়া লব নিজের আচরণের জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইল। "মৃষ্যন্ত্বিদানীং লবস্য বালিশতাং তাতপাদাঃ"—"লবের এই অবিমৃষ্যকারিতা ক্ষমা করুন" বলিয়া মার্জ্জনা চাহিল। রামচন্দ্র গুণগ্রাহী—তিনি লবের এই কার্য্যটিকে ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার বলিয়া আরও গৌরব দানই করিলেন, তেজস্বী অপরের তেজ সহ্য করে না, ইহা তাহার প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম্ম। সূর্য্যদেব অশ্রান্ত তাপ দিলে সূর্য্যকান্তমণি তেজঃক্ষরণ করিবেই ত।*

অকস্মাৎ লবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশের গুরুগম্ভীর স্বর নেপথ্য হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনের পথেই কুশ রাজসৈন্যের সহিত লবের যুদ্ধ-ব্যাপার শুনিয়া আসিয়াছিল। সে আজ পৃথিবী হইতে সম্রাট্ শব্দ তুলিয়া দিবে, ক্ষত্রিয় জাতির শস্ত্রাগ্নি চিরদিনের মত নির্ব্বাণ করিবে, এমনই তার দৃঢ় সঙ্কল্প। কুশের সেই মেঘগম্ভীর ধ্বনি কোথায়

---

* অনুরূপ শ্লোক কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে যথা—"স্পর্শানুকূলা অপি সূর্য্যকান্তাস্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্বহন্তি" এমন যে সুখস্পর্শ সূর্য্যকান্তমণি, অন্য-তেজের আক্রমণ পাইলে সেও দাহ করাইয়া থাকে। ভারবিতেও আছে—কিমপেক্ষ-মানঃ পয়োধরানাং ধ্বনতঃ প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ। প্রকৃতিঃ খলু সা মহীয়সঃ সহতে নান্যসমুন্নতিং যয়া॥ ভারবি ২য় সর্গ।

উত্তেজনা আনিয়া দিবে, মা—রামকে আরও পুলকিত করিল। অলক্ষ্যে পুত্রস্নেহও যে কার্য্য করিতেছিল না, তাহাও বলা যায় না। শকুন্তলার তনয় ভরতের দেহস্পর্শ দুষ্মন্তের উপরও একটি অজ্ঞাত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। লব ও কুশ দুইজনেই মহাবীর। অথচ উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্যও বিদ্যমান। কুশের তুলনায় লব অপেক্ষাকৃত কোমলপ্রকৃতি, কুশ অধিকতর তেজস্বী। বিশেষতঃ কনিষ্ঠভ্রাতা লবের সহিত রাজসৈন্যের সংগ্রাম শুনিয়া কুশ বিশেষরূপ উত্তেজিত হইয়াই আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল; তাই তাহাকে অত উদ্ধত, অত গর্ব্বিত, অত যুদ্ধপ্রিয় দেখাইয়াছিল। বস্তুগত্যা কুশ ঐরূপ নহে।

কুশ আসিয়া রামের সম্মুখে দাঁড়াইল। তার দৃষ্টি "তৃণীকৃতজগৎত্রয়সত্ত্বসারা" ত্রিজগতের বলপ্রকর্ষকে যেন তুচ্ছ করিতেছে। তাহার গতি এমতই ধীরোদ্ধতা, যেন পদভরে ধরিত্রীকে নামাইয়া দিয়া যাইতেছে। বয়সে কুমার অথচ পর্ব্বতের মত দৃঢ়। একি মূর্ত্তিমান্ বীররস—না, সাক্ষাৎ দর্প আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল।

লবের অনুরোধে আর রামচন্দ্রের অনুভাব-দর্শনে কুশ তখন রামায়ণ-কথানায়ক অযোধ্যানাথকে অভিবাদন করিল। রামচন্দ্রও তখন সেই "সজলজলধরস্নিগ্ধ" দেহখানি আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী এবং রাজ্যাধিকারী বলিয়া সাধারণতঃ পিতার প্রিয়তর হইয়া থাকে। আর পিতার সাদৃশ্যও জ্যেষ্ঠেই অধিকতর লক্ষিত হয়, তাই কুশকে আলিঙ্গন করিয়া রামের বিশেষভাবে মনে হইল—

"কিমপত্যমরং দারকঃ—" (পুত্রঃ)

অঙ্গাদঙ্গাৎ প্রসৃতইব নিজো দেহজঃ স্নেহসারঃ

প্রাদুর্ভূয় স্থিত ইব বহিশ্চেতনাধাতুরেব।

সান্দ্রানন্দ-ক্ষুভিতহৃদয়-প্রস্রবেণেব দৃষ্টো
গাত্রাশ্লেষে যদমৃতরসস্রোতসা সিক্তভাব॥

এ কি আমার সন্তান! সর্ব্ব অবয়ব হইতে ক্ষরিত আমার দেহজাত স্নেহসার কি সন্তানরূপে পরিণত হইয়াছে? শরীরমধ্য হইতে নিঃসৃত আমার চেতনাধাতু কি মূর্ত্তিমান্ হইয়া আসিয়াছে। "সান্দ্রানন্দ-ক্ষুভিতহৃদয়" কি দ্রবীভূত হইয়া পুত্ররূপে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তাই আলিঙ্গনে আমার গাত্র সহসা অমৃতরসস্রোতে সিক্ত হইয়া উঠিতেছে।

"অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে"—দুষ্মন্তেরও মনে হইয়াছিল, আমারই এই সুখ, না জানি পুত্রদেহ স্পর্শে জন্মদাতা পিতার কি সুখ হয়?

রামচন্দ্র তখন কুশ ও লবের মধ্যে রঘুকুলকুমারের ছায়া প্রত্যক্ষ করিলেন। সেই "কপোতকণ্ঠ-শ্যাম" দেহ, সেই সৌষ্ঠবপূর্ণ সুন্দর গঠন, সেই "প্রসন্নসিংহস্তিমিত" দৃষ্টি, সেই "মৃদঙ্গমাংসল" ধ্বনি—রঘুকুমার না হইয়া যায় না। আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখিলেন,—"একি, জনকতনয়ার সেই সৌসাদৃশ্য পরিস্ফুটভাবে বর্ত্তমান। প্রিয়ার আমার অভিনব শতদলের মত মুখশ্রীটী পর্য্যন্তও যেন সম্পূর্ণ বিদ্যমান। সেই-মতই মনোহারিণী মুক্তাদন্তচ্ছবি, সেই-মতই আরক্তিম অধরোষ্ঠ ভঙ্গী" আর সেই-মতই শোভমান কর্ণযুগল। নেত্রদুটী যদিও বীরোচিত, "রক্তনীল" তথাপি সেই মতই সৌভাগ্য-গুণযুক্ত, আর সেই-মতই নয়নানন্দকর।"

রামের চিত্তে তখন আশার নূতন তরঙ্গ খেলিতে দেখা গেল, "ইহাদের জৃম্ভকাস্ত্র স্বতঃপ্রকাশ ও জন্মসিদ্ধ দেখিতেছি, ইহা আমার আশ্বাস। আর নির্জ্জনে, বিস্রব্ধা ও সহজলজ্জাজড়নয়না, সীতার গর্ভগ্রন্থি ও দ্বিধা অনুভব করিয়াছিলাম। পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সীতার সেই "নিষ্কিত নির্ব্বাসন" তখন তাঁহার মনে পড়িল। যেন্ত্র

হইতে অশ্রুধারা গলিত হইয়া তাঁর কপোলদুটী বক্ষো প্লাবিত করিয়া দিল।

কুশলব আপনাদিগকে বাল্মীকির শিষ্যরূপেই মনে করে; তাহারা যে রামচন্দ্রের পুত্র, সীতার সন্তান, তাহা জানে না। তবে বাল্মীকির রচিত রামায়ণে রামসীতার অনেক কথাই তাহারা পাঠ করিয়াছে। পুত্রের মুখে, বিশেষতঃ শিশুজনের মুখে, পিতা মাতা বা রাজরাণীর অর্থাৎ রামসীতার প্রণয়ের কথা বড়ই মধুর লাগে। কুশ লবকে বুঝাইতেছে—"সীতার বিরহে রামের কত দুঃখ, প্রিয়ানাশে সমগ্র জগৎ তাঁহার কাছে অরণ্য, আর তাঁহাদের কি ভালবাসা, কিবা নিরবধি বিরহ।" "উঃ কি নিরবধি বিরহ"—তৃতীয়াঙ্কে একবার রাম নিজেই বলিয়াছিলেন; তথাপি রাম এখানে কাঁপিয়া উঠিলেন। প্রকৃত পক্ষে "নিরবধি" বিরহকে "সাবধি" করায় (রাম সীতার মিলন দ্বারা) কবি পাঠকগণের সহানুভূতির পাত্র এবং প্রশংসার ভাজনই হইয়াছেন।

কুশ রামকে রামায়ণের শ্লোক শুনাইতেছেন:—কি মধুর, কি উপভোগ্য! মন্দাকিনী-তীরে চিত্রকূট-বনবিহারে সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে রঘুপতির উক্তি:—

ত্বদর্থমিব বিন্যস্তঃ শিলাপট্টোঽয়মগ্রতঃ।
যস্যানুবন্ধিতঃ পুষ্পৈঃ প্রবৃষ্ট ইব কেশরঃ॥

দেবি, এই শিলাপট্টের আসনটি তোমার বসিবার জন্যই বিন্যস্ত আছে। দেখ, বকুলতরু পুষ্প-বৃষ্টি করিয়া ইহার চারিধার কেমন সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে।

রামের চক্ষুর উপর তখন ভাসিয়া উঠিল—"সীতার সেই "বাহু-কম্পিত" অলকাবলী, সেই রক্তিমোজ্জ্বল কপোল দুখানি, সেই "নিরাভরণবদনের" মুখশ্রী। রাম তন্ময়তায় চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া রহিলেন।

এদিকে বশিষ্ঠারুন্ধতী, বাল্মীকি, জনক ও দশরথমহিষীরা বালকদের যুদ্ধ সংঘটন শুনিয়া দ্রুতপদে যুদ্ধভূমি অভিমুখে আসিয়া পড়িলেন। বহুদিনের পর রামের সহিত সাক্ষাৎ; কোন্ মুখে আর রাম তাঁহাদের নিকট মুখ দেখাইবেন? ইহার অপেক্ষা রামের হৃদয় যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেলেও ভাল ছিল। দূর হইতে জনক কৌশল্যাদিরাও "অস্থিভব-মাত্রাবশেষ" ও সীতাশোকে শীর্ণকায় রামকে দেখিবামাত্র মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তারপর দুঃখের মধ্যে, মর্ম্মবেদনার মধ্যে, সান্ত্বনার মধ্যে তাঁহাদের মিলন সংঘটিত হইল। সে মিলন ভাষার প্রকাশের নহে, তাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়েরই যোগ্য। ঘটিলও তাই। আদি এবং বাৎসল্য রস যেন হাত ধরাধরি করিয়া পাশাপাশি দণ্ডায়মান। দুটী ক্ষুদ্র নদী একই সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবহমান। আদি এবং বাৎসল্য দুইটী রসই রামচন্দ্রে আসিয়া প্রকৃত পরিণতি লাভ করিয়াছে। দুইটী নদী একই সাগরে আসিয়া কৃতার্থ হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম অঙ্ক।

নাটকের মধ্যে নাটক। ইহা এক অপূর্ব্ব কৌশলময়ী রচনা। বাল্মীকি-রামায়ণের কিয়দংশ লইয়াই গর্ভনাটক বিরচিত। ভাগীরথী-তীরে এই নাটকাভিনয়ের স্থল। রাম, লক্ষ্মণ, লব, কুশ, চন্দ্রকেতু এবং জনক কৌশল্যাদি সকলেই এই নাটক শুনিবার আশায় উপবিষ্ট। স্বর্গের গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরারা পাত্র পাত্রীর ভূমিকা লইয়াছে। সে দৃশ্য দেখিবার জন্য, সে অভিনয় শুনিবার আশায় দেবীরা সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

যবনিকা উঠিল। নেপথ্য হইতে ভাগীরথী-তীরে বিসর্জ্জিতা সীতার করুণ বিলাপ-ধ্বনি শ্রুত হইল। বায়ুতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ভাগীরথী-পার-শ্রুত সঙ্গীতের মত সে রব কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল।

"হা আর্য্যপুত্র, হা কুমার লক্ষ্মণ, গভীর বনে আসন্ন-প্রসব বেদনা আমি একাকিনী; পাপাশয় শ্বাপদেরা আমাকে অভিলাষ করিতেছে। অশরণা আমি কি করিব? ভাগীরথীর কোলে আপনাকে এখন নিবেদন করিয়া আমি শান্তিলাভ করি।"

সূত্রধার জানাইল, প্রাপ্ত-প্রসব-বেদনা সীতা আপনাকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে। অভিনয়ের দর্শনে রামচন্দ্র তখন এমনই তন্ময়—এমনই আত্মহারা যে, অভিনয়কে বাস্তব মনে করিলেন। উত্তম নাটক অভিনয়-দর্শনে প্রকৃত রসজ্ঞ সহৃদয় শ্রোতার এ ভ্রম ঘটিয়াই থাকে। দর্শনশাস্ত্রে বলে, গাঢ়স্মৃতি নিরন্তর ভাবনা-প্রকর্ষে প্রত্যক্ষ-দর্শনাকারে ফুটিয়া থাকে। উদ্ভ্রান্ত রাম বলিয়া উঠিলেন—

"দেবি, ক্ষণেক অপেক্ষা কর; লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, তুমি দেখ!" রামের হস্ত তখন অবশ, ইন্দ্রিয় ঘূর্ণমান, চিত্ত বিমূঢ়। তাই তিনি সীতাকে রক্ষা করিবার জন্ত লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণ তখন অশ্রু-ভার স্তম্ভিত করিয়া রামচন্দ্রকে ধরিয়া কহিল, "আর্য্য, নাটকমিদম্"— এযে, নাটক! প্রথমাঙ্কে চিত্রদর্শন-প্রস্তাবে শূর্পনখার চিত্র দেখিয়া সীতারও শূর্পণখা-প্রতীতিই জন্মিয়াছিল। তখন রামচন্দ্রই সীতাকে বুঝাইয়াছিলেন, "অয়ি বিরহ-ভীতে, 'চিত্রমেতৎ",— এযে চিত্র!

তাহার পর পৃথিবী ও ভাগীরথীর অঙ্গে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সীতাদেবী রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইল। সীতার দুইটী যমজ শিশু পদ্ম-কোরকের মত পৃথিবী ও ভাগীরথীর কোলে শোভা পাইতেছিল। শোকে ও প্রসব-বেদনায় সীতা তখন অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা। পৃথিবী ও ভাগীরথী তখন সীতাকে জানাইলেন যে, এই দুইটি যমজশিশু গঙ্গার জলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কোথায় মৃত্যু. আর কোথায় এমন সুন্দর দুইটী যুগল শিশু। সীতা তখন প্রত্যাগতজীবিতা ও সমাশ্বস্তা হইল, আপনার বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া আনন্দে, শোকে ও যুগপৎ ভাবাভিঘাতে "হা আর্য্য-পুত্র" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বড় সাধের, রঘুবংশের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ এই পুত্রদুটীকে আর্য্যপুত্রের ক্রোড়ে দিতে পারিল না—ইহাই সীতার বড় দুঃখ! সীতা মর্ম্মে মর্ম্মেই এ দুঃখ অনুভব করিল।

সীতা জানিল, ইনি রঘুকুল-দেবতা গঙ্গা আর ইনি গর্ভধারিণী জননী ধরিত্রী। এতদিনের পর, এমত দুঃখের সময়ে সীতা মাকে পাইল। উন্মত্তা কন্যা বালিকার মত মায়ের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মা ভিন্ন সন্তানের ব্যথা আর কে বুঝিবে, পতিহীনা কন্যার অবলম্বন আর কে হইবে? সীতা যেন অকূলে কূল পাইল। দুঃখের অঁধারে আশ্বাসের আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল। কন্যার মুখে "আর্য্যপুত্র"

উচ্চারণ শুনিয়া সর্বংসহা পৃথিবীরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—"আঃ কে তোর আর্য্যপুত্র' এইরূপে কন্যা তিরস্কৃতা হইল। যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করিল না, সে 'আর্য্যপুত্র' সম্বোধনের যোগ্যই নহে। নিরভিমানিতা আদর্শ প্রণয়ের লক্ষণ। ইহাই সীতা-চরিত্রের অলঙ্কার। কন্যার এ তেজঃশূন্যতা মাতার কাছে অসহ্য প্রতীত হইল। জননীর পক্ষে কন্যার অপমানজনক নির্ব্বাসন কত বড় আঘাত দিয়া থাকে, তাহা ধরিত্রীর 'আঃ' কে তোর আর্য্যপুত্র' এই কথাটাতেই বুঝা যায়। সীতা তখন মায়ের কাছে ভয়ে কাঁটা, লজ্জায় জড়সড়।

রঘুকুল-কুমারদ্বয়ের যোগ্য ক্ষত্রিয়-সংস্কার কে দিবে, ভাবিয়া সীতা তখন ব্যাকুলা হইয়া পড়িল। পুত্র শুধু বাঁচিয়া থাকিলে চলিবে না; রঘুকুলের বালক রঘুকুলের উপযুক্ত হওয়া চাই। করুণাময়ী ভাগীরথী সীতাকে সান্ত্বনা দিলেন—বৎসে, সেজন্য তোমার ভাবনা নাই। স্তন্য-ত্যাগের পর তোমার পুত্রদের ভার আমি বাল্মীকির করে অর্পণ করিব। সেই ঋষিই ইহাদের যথোচিত ক্ষত্রিয়-সংস্কার করাইবেন। চিত্রদর্শন-প্রস্তাবে রামচন্দ্র রঘুকুলের দেবতা ভাগীরথী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া কহেন—"দেবি ভাগীরথি, স্নুষারামরুন্ধতীব সীতায়াং শিবানুধ্যান-পরা ভব।" গঙ্গাদেবী সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া রঘুকুলের দেবতার কার্য্য করত রামের সম্মান রক্ষা করিলেন।

জননী ধরিত্রী, কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া "পরিপাণ্ডুদুর্ব্বল-কপোল-সুন্দর" মুখখানি তুলিয়া কহিলেন,—"চল বৎসে, আমার পাতালগৃহ পবিত্র করিবে।" সীতা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

"তোমার অঙ্গে কেন আমায় বিলীন করিয়া লও না মা? আমি যে জীবনের এতবড় বিপর্য্যয় সহ্য করিতে পারিতেছি না।" বড় দুঃখে, বড় লজ্জায় সীতা ইহা কহিল। সীতা নিজের জীবনের পরিবর্ত্তন

জীবলোকের পরিবর্ত্তন বলিয়া বুঝিল। মনে দুঃখ থাকিলেই জীবলোক দুঃখময়, ইহাই স্বাভাবিক। সেই রামময়-জীবিতা, বনযাত্রার সঙ্গিনী সেই সীতা—আর নিন্দিত নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিতা এই অভাগিনী সীতা।

পৃথিবী ও ভাগীরথীর স্কন্ধে ভর দিয়া সীতা ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল; গর্ভনাটকও শেষ হইল। সীতাবিসর্জ্জন-সম্বন্ধে রামচন্দ্র অসহায়া সীতাকে দেখিবার ভার লইবার জন্ত ধরিত্রীদেবীকে অনুরোধ করেন,—"ত্বমবেক্ষস্ব জানকীমিতি।"

যদিও আপনার কন্তা সীতার উপর ধরিত্রী দেবীর স্নেহ স্বাভাবিক—সীতা যে রামের সামগ্রী, রাম ভার না দিলে তিনি সীতার ভার লইতে পারেন না তজ্জন্ত রামের এই ভারার্পণ।

সীতা লোকান্তরে (পাতালই এখানে লোকান্তর) প্রস্থান করিল। এই তিরোভাব, এই অতর্কিত উপস্থিতির পর সীতার এই তিরোভাব রাম সহ্য করিতে পারিলেন না—মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। লক্ষ্মণ তখন বাল্মীকিকে লক্ষ্য করিয়া বেদনাবিদ্ধ স্বরে বলিল, "ভগবন্! রক্ষা করুন! এই কি আপনার নাটকের উদ্দেশ্ত, এই কি প্রয়োজন?"

মহাপুরুষের অনুষ্ঠানের ফল শুভ ব্যতীত অশুভ হয় না। রামের জীবনই যদি সংশয়িত হইল, তবে ইহা অপেক্ষা আর মন্দ ফল কি হইবে?

সহসা গঙ্গাসলিল ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; তাহার মধ্য হইতে সীতাদেবী সত্য সত্যই উত্থিত হইল। নাটক বাস্তব হইয়া দেখা দিল, ছায়া মূর্তিমতী হইল। তখন পৃথিবী ও ভাগীরথী বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"জগতের বন্দনীয়া দেবি, আমরা আজ পুণ্যব্রতা সীতাকে তোমার নিকট অর্পণ করিলাম।" রাম মূর্চ্ছিত, এ সময় অরুন্ধতীর অন্য কোন চিন্তা নাই। কি করিয়া রাম বাঁচিবেন, সেই ভাবনায় অরুন্ধতী

দেবী সীতাকে অনুরোধ করিলেন—"অবহিত হও বৎসে, এ লজ্জার সময় নয়। আমার বৎস রামকে তুমি পাণিস্পর্শে সঞ্জীবিত কর।"

তৃতীয়াঙ্কে ছায়ারূপা সীতা তমসার কথায় মূর্চ্ছিত রামকে স্পর্শ করিয়াছিল। সে এক অবস্থা, সে এক সময়। আর আজ অরুন্ধতীর কথায় সীতা সসম্ভ্রমে মূর্চ্ছিত রামের অঙ্গস্পর্শ করিল, এ আর এক অবস্থা, এ আর এক সময়! অবস্থা ও সময়ের পার্থক্যের মধ্যে একটি ঐক্য ছিল, যাহা সর্ব্বত্রই সমান। অরুন্ধতী তখন পৌরজনকে লক্ষ্য করিয়া সীতাদেবীর গ্রহণ সম্বন্ধে তাহাদের মত জানিতে চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অলীক অপবাদ দেওয়ার জন্ত তাহাদের তিরস্কারও করিলেন—তখন পৌরজনেরা লজ্জায় অধোবদন রহিল। তাহাদের কর্ণে অরুন্ধতীর উচ্চারিত বাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—

"পৌরজনগণ, গঙ্গা ও পৃথিবী যাহাকে পবিত্রা জানিয়া হাতে ধরিয়া আনিয়া দিলেন, অগ্নি যাহার পুণ্যচরিত্রের সাক্ষীস্বরূপ আছেন, সেই দেবজনসম্ভবা সূর্য্যকুল-বধূ সীতা আজ পরিগৃহীত হইবে—এ বিষয়ে তোমরা কি বলিতে চাও?"

পৌরজনেরা আর কি বলিবে? তাহারা আজ নিজেদের কৃতকার্য্যের জন্ত অনুতপ্ত। তাহারা আজ বার বার সীতাদেবীকে নমস্কার করিতে লাগিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সীতাদেবীর গ্রহণ সাব্যস্ত হইল।

দেবতারা পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা, ঋষিরা আশীর্ব্বাদ দ্বারা এই গ্রহণ ব্যাপারটাকে অভিনন্দিত করিল।

কুশ লব জানিল, রামচন্দ্র তাহাদের পিতা, লক্ষ্মণ কনিষ্ঠতাত, সীতাদেবী গর্ভধারিণী মাতা, রাজর্ষি জনক মাতামহ। বালকদের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। মিলনের সুধাবেগে সকলেরই প্রাণে তখন একটা অনাবিল তৃপ্তি দেখা দিল।

মিলনের নিবিড় আনন্দে উত্তর-রামচরিত নাটকটাও সার্থক হইয়া উঠিল। রামায়ণের এতবড় বিয়োগান্ত ব্যাপারটিকে কবি এক নূতন রূপে ফুটাইলেন। এক নূতন ভাবধারা আনিয়া দিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া গেলেন। সংস্কৃত নাটক বিয়োগান্ত হইবার রীতি নাই বলিয়াই যে তিনি ইহাকে মিলনান্ত করিয়াছেন—ইহা বলিলে কবি-প্রতিভার অসম্মান করা হয়।

তিনি বুঝিয়াছিলেন, সীতার মত সাধ্বী ও পতিপ্রাণার মর্ম্মান্তিক যাতনা যদি না দূর হইল, মর্ম্মস্থলে দৃঢ়নিখাত শল্য যদি না উন্মোচিত হইল, তবে পতিভক্তির ও অলৌকিক সতীত্বের মর্য্যাদা কি রহিল? সীতার চক্ষুজল শুকাইল না, রামের "পুটপাক-প্রতীকাশ" শোক দূর হইল না, ভবিষ্যতে—চির অনাশ্বাস জাগিয়া থাকিল, পুণ্য ও স্বার্থত্যাগের জয় দেখান হইল না—তবে কি হইল? কাব্যে ইতিহাসে যাহা থাকে থাকুক, রঙ্গমঞ্চে ইহা চলিবে না; এই সকল ভাবিয়াই কবি ভবভূতি নাটকে রামসীতার মিলন দেখানই ভাল মনে করিলেন। গর্ভনাটক দেখাইবার ছলে লক্ষ্মণের মুখ দিয়া কবি তাঁহার এই মনগত ভাবটী প্রকাশও করিয়া গিয়াছেন।—"ভগবন্, এই কি আপনার কাব্যের উদ্দেশ্য" (প্রয়োজন, অর্থ)?

রামসীতার মিলন কে না চাহে? অন্ততঃ নাটকে এ মিলন দেখিয়া কে না তৃপ্ত হয়? সকলে (অন্ততঃ অনেকে) যাহা চাহে, কবি প্রতিনিধিরূপে তাহাই চাহিয়াছেন মাত্র।

পরিণামে রামসীতার মিলন দেখাইতে হইবে বলিয়াই তৃতীয় অঙ্কে ছায়া-সীতার পরিকল্পনা। (তৃতীয় অঙ্কে) রামের সেই করুণ দুর্ব্বল অবস্থা দেখিয়া সীতার নিশ্চিত নির্ব্বাসন-জনিত কঠিন হৃদয় কোমল হইয়াই আইলে, "হিরন্ময়ী সীতা প্রতিকৃতি দেখিয়া বাষ্পসিক্ত আঁখির চক্ষু

নির্বাসিত করিব"—রামের এই কথাতেই সীতার লজ্জাবসান-পর্দাটি উৎপাটিত হইয়া যায়—তাই সীতা রামকে স্পর্শ করিয়া বলিতে পারিয়াছিল "অপবাদিত হউন, আর্য্যপুত্র!" পৃথিবী ও ভাগীরথী দ্বারা প্রদত্তা হইয়া, অরুন্ধতীদেবী কর্ত্তৃক অভিনন্দিতা হইয়া সীতা এই অভিমানের বাধা ঘুচাইয়া দিয়া রামের পার্শ্বে গিয়া বসিতে পারিয়াছিল।

সতীত্ব-তেজে উদ্দীপ্তা সীতার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সতীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া কবি যে ভাবে মিলনটী সম্পন্ন করিলেন, অথচ রামচরিত্রের গৌরব এতটুকুও ম্লান করিলেন না, তাহা যে তাঁর নবোন্মেষিনী প্রতিভারই পরিচায়ক, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সম্পূর্ণ।